শাহনামার গল্প

হালিমা খাতুন

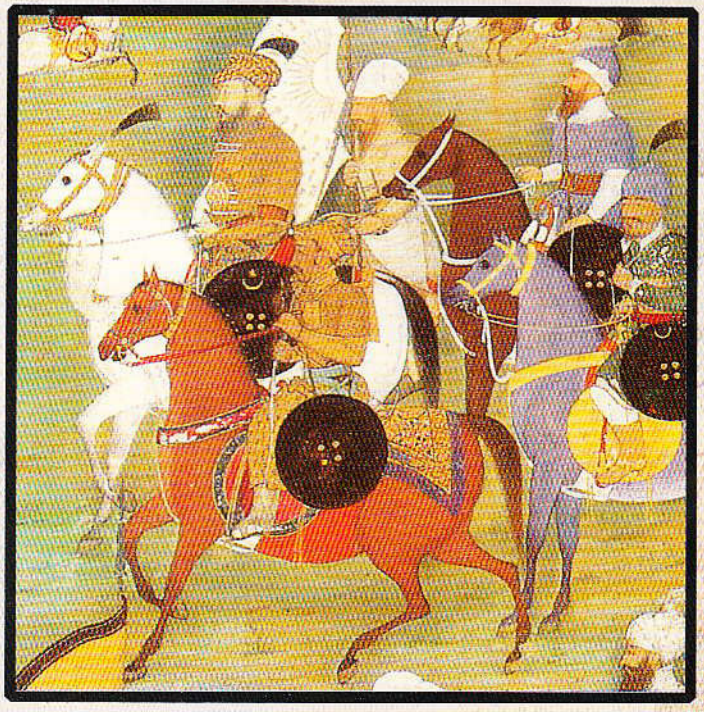

শাহনামার গল্প

হালিমা খাতুন

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি
স্থাপিত : ১৯৭৮
অন্তর্ভুক্তি নং
৫৯৪২১৬
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

আজকাল প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রকাশক : চিন্ময় পাল, আজকাল প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস, ৭ শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৬০.০০ টাকা

ISBN 984 569 051 3

SHAHNAMAR GALPA (Story of Shahnama) by Halima Khatun.
Published By : AAJKAL PRAKASHANI 38/4 Banglabazar Dhaka 1100
Second Print : April 2009. Price : 60.00 only.

অনেক দিন আগে ইরান দেশে মহাকবি ফেরদৌসী জন্মগ্রহণ করেন। ফেরদৌসী কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়, আসল নাম ছিল আবুল কাসেম। তাঁর কবিতা শুনে খুশী হয়ে গজনীর বাদশা সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসী উপাধি দেন। ফেরদৌসী শব্দের অর্থ বেহেস্তী বা স্বর্গীয়। মহাকবি ফেরদৌসীর অমর সৃষ্টি শাহনামা।

শাহনামা বলতে সাধারণত রাজা বাদশাদের কাহিনী বোঝায়। ফেরদৌসীর শাহনামা কিন্তু কেবলমাত্র রাজা রাজড়ার কাহিনী নয়। এর মধ্যে রয়েছে অনেক বীর যোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী ও অনেক অনেক রূপকথা, জিন পরী দৈত্য দানবের গল্প। তা ছাড়া বর্ণিত সময়ের শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারিত ইতিহাস মনোজ্ঞভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। এই অনবদ্য গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবিতায় রচিত। ষাট হাজার পংক্তি বা শ্লোকে ফেরদৌসী এই মহাকাব্য রচনা করেন।

গজনী থেকে অনেক দূরে তুস্ নামক এক নগরে ফেরদৌসীর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। জন্মভূমি তুস্ নগর ও তার আশেপাশের লোকেরা ফেরদৌসীর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। গরীব ঘরে জন্মেছিলেন বলে নিজের কবিত্ব প্রতিভা দূর দূরান্তে পৌঁছে দেবার বা তার বদলে ধনদৌলত পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ফেরদৌসী গজনীর বাদশা সুলতান মাহমুদের দরবারে যাওয়া মনস্থ করলেন। রাজদরবার তো যেমন তেমন জায়গা নয়। সেখানে যাওয়ার জন্য অনেক কিছু দরকার। সব কিছু জেনেও গরীব কবি এগিয়ে চললেন। আর নিজের বুদ্ধি ও কবিত্ব শক্তির সহায়তায় সুলতান মাহমুদের দরবারে ও তাঁর মনে স্থায়ী আসন করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফেরদৌসীর কবিত্ব প্রতিভা বাদশাকে মুগ্ধ করে। তিনি ফেরদৌসীকে ইরানের ইতিহাস কাব্যে রচনা করতে অনুরোধ করেন বাদশার প্রস্তাবে কবি রাজী হলেন এক শর্তে। শর্তটা হল কবিতার প্রতি পংক্তির জন্য একটা করে স্বর্ণমুদ্রা কবিকে দিতে হবে। বাদশা তাতেই রাজী হলেন। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ফেরদৌসী ষাট হাজার পংক্তিতে শাহনামা রচনা করলেন। ইরানের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস যা ছড়িয়ে ছিল চারণদের মুখে মুখে তাই তিনি গেঁথেছিলেন শাহনামায়।

কিন্তু এত সুন্দর কবিতা লিখেও কবির সুখ হল না। কারণ গজনীতে আসার পর থেকে তার শত্রুর অভাব ছিল না। বিশেষ করে ছোটখাটো কবিরা তো সারাক্ষণ তাকে হিংসা করত। এবার তারা একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। শাহনামা থেকে তারা কয়েকটা লাইন বাদশাকে শোনালেন যেখানে বাদশাকে ক্রীতদাসের সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যি ঘটনাও কিন্তু তাই। সুলতান মাহমুদের বাবা সবুক্তগীন সম্রাট আলমগীরের ক্রীতদাস ছিলেন। সম্রাট সবুক্তগীনের কাজে ও

ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ একথা জানতেন। তবুও তিনি একথা লেখার জন্য ফেরদৌসীর ওপর মহাখাপ্পা হলেন। দুষ্ট লোকের কথা শুনে বাদশা তার প্রতিশ্রুত ষাট হাজার সোনার মোহরের পরিবর্তে কবিকে ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রা পাঠালেন।

শাহনামার কবি

বাদশার এই ব্যবহারে ফেরদৌসী খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি রৌপ্যমুদ্রাগুলো চাকর-বাকরদের বিলিয়ে দিলেন। ফেরদৌসী রৌপ্যমুদ্রা চাকরদের দিয়ে দিলেন বলে বাদশা তাঁর ওপরে আরও ভীষণ রাগ করে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অবশ্য পরে বাদশা ফেরদৌসীকে গজনী ছেড়ে চলে যেতে বললেন। প্রাণভয়ে কবি গজনী ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার বেলায় কবি একটা কবিতা লিখে গেলেন; যার অর্থ হল, তুমি যদি সত্যিই রাজার ছেলে হতে, তা হলে ওয়াদা খেলাপ না করে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে।

এতে বাদশা আরও ক্ষেপে কবিকে বন্দী করার জন্য চারদিকে চর পাঠালেন। ইরানের বাইরে ছোট্ট এক রাজ্যে কবি আশ্রয় নিলেন। গভীর দুঃখে কবির মন ভেঙ্গে গেল। এর পরে তিনি খুব বেশি কবিতা রচনা করেন নি। ক্রমে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। অসুস্থ হয়ে শেষ জীবনে তিনি জন্মভূমি তুস্ নগরে ফিরে যান।

ওদিকে বাদশা সুলতান মাহমুদ ক্রমে ক্রমে অনুভব করলেন যে, কবিকে অসম্মান করে তার অমর মহাকাব্যের উপযুক্ত সম্মান না দিয়ে তিনি কি অন্যায় করেছেন। তখন তিনি ষাট হাজার মোহর, অনেক দামী দামী উপহার কবির জন্য তুস্ নগরে পাঠালেন। কিন্তু এই মোহর ও উপহার নিয়ে রাজার লোকেরা গিয়ে দেখল কবির মৃতদেহ দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাদশার লোকেরা কবিকে সেই মোহরও উপহার দিতে চাইলে কবির কন্যা তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

লেখকের অন্যান্য বই

বড়দের জন্য

Silhouette And Starlight
The Rest ot the Time
শিশুদের নিয়ে ভাবনা
দুর্ভাবনার [illegible]ড়িতে

ছোটদের জন্য

কাঁঠাল খাবো
বাঘ ও গরু
The Tiger and the Peanut Cow
বেবী ফ্রক গায়
বাচ্চা হাতির কাণ্ড
যুক্ত বর্ণের সেপাই শান্ত্রী
পশু পাখির ছড়া
An other goose
মজার পড়া
সবচেয়ে সুন্দর
কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ
রস কদম্ব
বনের ধারে আমরা সবাই
পরিবেশ পরিচিতি
পঞ্চমালার বনে
মস্ত বড় জিনিস
হঠাৎ খুশী
হরিণের চশমা
মানিক পেয়ে রাজা

প্রাচীন ইরানের পরিচয়

ইরানের প্রাচীন নাম পারস্য। প্রাচীন যুগের যাযাবর পারসীকরা এক অজ্ঞাত কারণে ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ইরানী মালভূমিতে প্রবেশ করে। ক্রমে তারা ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে মিডিয়াতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রীস্টপূর্ব ৭ম শতকে অঞ্চলটি অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যাবিলনের রাজাদের সহযোগিতায় পারসীকরা অ্যাসিরীয়দের পরাজিত করে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে।

মিডিয়দের সাথে সেমেটিক জাতির সংঘর্ষ লেগেই থাকত। সেইসব জয়পরাজয়ের কাহিনী শাহনামার অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে।

খ্রীস্টপূর্ব ৭ম শতকে মিডিয়া বাসিগণ এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। মহাবীর সাইরাস বা কাইরাস খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে নিজেকে মিডিয়ার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত করে বাহুবলে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাইরাসই 'শাহনামা'র কায়খসরু।

কবি ফেরদৌসী মিডিয়াকে রোম বলে উল্লেখ করেছেন এবং বল্‌খ ও বোখারাকে তুরান নামে অভিহিত করে এই দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সংঘর্ষকে তাঁর মহাকাব্য শাহনামার উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ইরানের জাতীয় বীর রুস্তমের আবির্ভাব এই সমসাময়িককালে। এই সময় থেকেই শাহনামার কাহিনী কিম্বদন্তীর অরণ্য পার হয়ে ইতিহাসের সমভূমিতে অবতরণ করেছে।

মূল কাহিনী

অনেক অনেক দিন আগে ইরানের এক বাদশা ছিলেন। তার নাম কায়ুমুর্‌স বা কায়মোরাস। পাহাড় ঘেরা দেশ ইরান। কায়ুমুর্‌স সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'প্রথমে পর্বত ছিল তার নিলয়, সেই পর্বত থেকেই সূচনা হয়েছিল তার সৌভাগ্য এবং সিংহাসনের।' প্রচণ্ড শক্তিশালী কায়ুমুর্‌স ছিলেন প্রকৃতির বরপুত্র। প্রথমে তিনি ও তার সহচর সৈন্যদল ব্যাঘ্রচর্ম পরে এসেছিলেন।

কায়ুমুর্‌স যেমন ছিলেন শক্তিশালী তেমনি ছিলেন জ্ঞানী। মানুষ তো দূরের কথা, বনের পশু পাখি তার কথা মত চলত। তিনি তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন। অরণ্য পর্বতের উপরে তাঁর আধিপত্য ছিল প্রবল। সেখান থেকে তার খাদ্য ও পরিধেয় আসত। এ ছাড়া মানুষের উপর আধিপত্য তো তাঁর ছিলই। ঐশ্বর্য ও প্রতাপে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। পরম সুখে দিন কেটে যাচ্ছিল বাদশা কায়ুমুরস ও তার রাজ্যের প্রজাদের।

কায়ুমুর্‌স আলোকের পূজারী। অন্ধকারের সাথে আলোর বিরোধ চিরকালের। কিছু কাল যেতে না যেতে তাই অন্ধকারের অনুসারী দানবের আক্রমণে কায়ুমুরস্ রাজ্যে অশান্তি নেমে এল।

ইরান সীমান্তের পাশে আলবুর্জের পর্বত। আলবুর্জের অপর পাশের লোকেরা ছিল দেখতে কালে ও কদাকার। আসলে বিশালদেহী এই লোকেরা ছিল মায়াবী দানব। দানবেরা মানবের চিরশত্রু। তাদের রাজা ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও কুটিল। ইরানের সুখ-সমৃদ্ধি তার সহ্য হত না। একদিন হঠাৎ করে সে ইরান আক্রমণ করে বসল।

কায়ুমুরস্ ও তার সাহসী সন্তান সিয়ামক বীরদর্পে রাজ্য রক্ষার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ব্যাঘ্রচর্মে সজ্জিত হয়ে কুরার সিয়ামক কৃষ্ণদানবের সাথে লড়তে লাগলেন। হঠাৎ একসময় দানব রাজা অতর্কিত সিয়ামককে ধরে শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল ও তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্নভিন্ন করল তার কলজে। সিয়ামকের মৃত্যুতে সেনাদল গভীর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। তারা দানবের হাতে বন্দী হল। রাজ্যহারা শোকার্ত

বাদশা কায়ুমুরস্ মনের দুঃখে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন।

আঁধারের জীব কৃষ্ণ-দানবের অত্যাচারে সারা দেশ জর্জরিত হল। মানুষের দুঃখের সীমা রইল না। দেশবাসী দানবের গোলাম হয়ে রইল এক বছর। ইরানের দুঃখে বিধাতার দয়া হল। কায়ুমুরস্ একদিন দৈববাণী শুনতে পেলেন; 'আর ক্রন্দন নয়। সেনাদল সজ্জিত কর ও দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত কর। জয় তোমার সুনিশ্চিত।'

দৈববাণী শুনে বাদশা আশায় বুক বাঁধলেন। দেশকে বাঁচাবার জন্য ও পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি সেনাদল সংগ্রহ করলেন। কেবল মানুষ নয়, বনের হিংস্র জীবজন্তু পশু-পাখি সাপ-বিছাও তার সঙ্গে চলল দানব দমনে। সিয়ামকের পুত্র হোশঙ্গ বা হোসেনকে সেনাপতি করে বাদশা যুদ্ধযাত্রা করলেন।

কায়ুমুরসের সেনাদলের আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কৃষ্ণকায় দানবরাজা বের হয়ে এল। তারপর শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে সে যাদুবলে প্রচণ্ড ঝড় তুলল ও আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল। কায়ুমুরসের সেনাদল মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে যুবরাজ হোশঙ্গ দৈত্যরাজকে তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাজার মৃত্যু হলে দানব-সেনারা পিছু হটতে লাগল। কায়ুমুরসের বাহিনীর বাঘ ও সিংহ অনেক সেনাকে সাবাড় করল। বাদশার অনুগত পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে অনেক সেনার চোখ তুলে ফেলল। বিষধর সাপ ও বিছার কামড়ে বাকি সেনারা প্রাণত্যাগ করল।

এভাবে আলোকের শত্রু সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হল। ইরানে আবার সুখ ফিরে এল। মাঠে মাঠে সবুজ ফসল আর ফুল বাগানে ফুলের সমারোহ দেখা দিল। দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর বাদশা মারা গেলে তার পৌত্র হোশঙ্গ ইরানের সিংহাসনে বসলেন।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাদশা হোশঙ্গ ছিলেন জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তার সময়ে ইরানে সর্ব প্রথম লৌহ অস্ত্রের ব্যবহার ও কৃষিকাজে জলসেচের ব্যবস্থা চালু হয়। কৃষি কাজের উন্নতির সাথে সাথে দেশবাসীর খাদ্য ও বস্ত্রের নিশ্চয়তা সূচিত হয়। এর পূর্বে মানুষেরা গাছের ফলমূল খেতো ও গাছের ছাল ও পশুচর্ম পরিধান করত। বাদশা হোশঙ্গের সময় থেকেই ইরানে অগ্নি পূজার প্রচলন হয়।

বাদশা হোশঙ্গের মৃত্যুর পর তার এক পুত্র তহমুর্‌স ইরানের সিংহাসনে বসেন। ত্রিশ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তহমুর্‌স রাজত্ব করেন। তিনি বলেছিলেন : এই পৃথিবীর প্রতিটি কল্যাণকর বস্তুকে অজ্ঞানতার বন্দীদশা থেকে আমি মুক্ত করে আনব। তহমুর্‌সের সময়ে ইরানে প্রথম মেষলোম থেকে পশমী বস্ত্র তৈরী শুরু হয়। এই সময়ে বিভিন্ন পশু পাখি মানব কল্যাণের কাজে ব্যবহার হতে লাগল। বাদশা দেশ থেকে সমস্ত দুর্নীতি দূর করে দেশে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শয়তানকে বন্দী করে তিনি পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করেন। ফলে দৈত্যদের সাথে তার বিরোধ বাধে। যুদ্ধে দৈত্যেরা পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে অলোকের অনুসারী হয়।

এর পর ইরানের সিংহাসনে বসলেন বাদশা জমশেদ। তিনি যেমন বলবান তেমনি ছিলেন সৌন্দর্যবান, তার উপরে পরম জ্ঞানী ও কৌশলী। লোহা আগুনে গলিয়ে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, কবচ ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ এবং রেশমী ও সূতী বস্ত্র তৈরীর কৌশলসহ অনেক কৌশল তিনি দেশবাসীকে শেখান। সমাজে বিভিন্ন পেশার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয় এ সময়ে।

গৃহনির্মাণের জন্য ইট তৈরি এবং পাথর দিয়ে প্রাসাদ ও প্রাচীর ইত্যাদি স্থাপত্য শিল্পের সূচনা করেন সুদক্ষ সম্রাট জমশেদ। মণিমুক্তা রত্নরাজি, লোবান, কর্পূর, মৃগনাভি ইত্যাদি সুগন্ধি ও চিকিৎসা-সামগ্রীও এ সময় আবিষ্কৃত হয়। যাতায়াতের জন্য নৌশিল্পের সূত্রপাতও সম্রাট জমশেদের সময় হয়। কাজেই দেখা যায় মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বহু উপকরণ সুদক্ষ সম্রাট

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

জামশেদের অবদান। এভাবে শিল্পকলা ও জ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে ইরান উন্নতির পথ ধরে চলতে লাগল।

অন্যদিকে বাদশা জমশেদের প্রতাপে জীন পরী দৈত্য দানবও তটস্থ হয়ে থাকত। তারা তার আদেশ পালন করত। পরীরা নাকি তার সিংহাসন বয়ে নিয়ে যেত। কাস্পিয়ান সাগরে বাদশার প্রমোদ তরী চালাত জীন মাঝিরা। শুধু তাই না, বিশ্ব প্রভুর দিদার থেকেও তার কাছে আসত বাণী, আসত প্রেরণা।

সকল সুখের অধিকারী বাদশা জমশেদ ছিলেন অটুট স্বাস্থ্য আর চিরযৌবনের প্রতীক। জরা ব্যাধি রাজা কেন, সে রাজ্যের কাউকেই স্পর্শ করত না। এমনি সুখের মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল ইরানের। কিন্তু সুখের রাজ্যে একদিন দুঃখের ছায়া প্রবেশ করল। বাদশার মনে অহংকার জন্মাল। ক্ষমতাগর্বে গর্বিত জমশেদ ভাবলেন যে তিনিই সব কিছুরই মালিক, দুনিয়ার বাদশা। তিনি একদিন প্রজাদের ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সুখের জন্য শিল্প সৃষ্টি করেছি, তোমাদের জন্য সুখাদ্যের ব্যবস্থা করেছি, জরা মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে তোমাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেছি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বপ্রভু বলে সম্বোধন কর।"

বাদশার এই শ্লাঘার কথা শুনে প্রজারা মর্মাহত হল। ব্যথায় তাদের মন ভেঙ্গে গেল। তারা কেউ বাদশার কথা মেনে নিল না। তারা সবাই বলল : এ দুনিয়ার মালিক একমাত্র বিশ্বপ্রভু।

প্রজাদের কথায় বাদশা রেগে তাদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। এমন সময় অগ্নিগিরি থেকে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল। চারিদিক আগুন আর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে চুরে তছনছ হয়ে গেল। ভাঙ্গা প্রাসাদের ভিতর দিয়ে বিরাট সরীসৃপ বের হয়ে আসতে লাগল। প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল হীরা মুক্তা মাণিক্যের সব ছটা।

বাদশা জমশেদ অহঙ্কারের জন্য সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে একদম নিঃস্ব হল। তার চারিদিকে কেউ আর রইল না। সমস্ত

শক্তি তাকে পরিত্যাগ করল, ইরানের শত্রু ঘৃণ্য অত্যাচারী জোহাক এসে ইরান দখল করল। বাদশা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শাহনামার গল্পের এই পর্বে রয়েছে জোহাকের কাহিনী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সাহসী ও সুদক্ষ অশ্বারোহী জোহাক ছিল আরবীয় বংশোদ্ভূত। এত গুণসম্পন্ন হয়েও সে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করে শয়তানের নির্দেশ মত চলতে লাগল। শয়তান তাকে একসময় বলল যে, সে তাকে সূর্যের চেয়েও বড় করে দেখে যদি জোহাক তার পিতাকে হত্যা করে। শয়তানের কথামত জোহাক তার পিতার উপাসনালয়ে যাওয়ার পথে কূপ খনন করে তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিল।

জোহাকের পিতা ছিলেন পরম ধার্মিক নৃপতি। প্রতিদিন শেষরাতে তিনি প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত উপাসনালয়ে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিধাতার আরাধনা করতেন। সেদিনও পুণ্যবান রাজা উপাসনালয়ে যাবার সময় অতর্কিতে সেই কূপের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারালেন। রাজ্যের লোকেরা গভীর শোকে অভিভূত হলেও জোহাক মনের আনন্দে সিংহাসনে বসল।

শয়তান কিন্তু জোহাককে ছাড়ল না। সে তাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল। অহঙ্কারী জমশেদকে বিতাড়িত করে সে ইরান অধিকার করে নিল। ইরানবাসীর দুর্দশার অন্ত রইল না। এবার শয়তান উঠে পড়ে লাগল কি করে বেইমান জোহাককে দিয়ে ইরানের জনগণকে শেষ করা যায়। কেমন করে চিরকালের মত তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া যায়। সেজন্য সে নানা কৌশল উদ্ভাবন করতে লাগল।

শয়তান একদিন বাবুর্চির বেশ ধরে জোহাকের কাছে হাজির হল। সে বলল : আমি একজন খুব ভাল বাবুর্চি। আমাকে আপনার বাবুর্চির কাজ দিন।

শয়তানের মিষ্টি কথায় লোভী জোহাক তাকে তার বাবুর্চিখানার ভার দিয়ে দিল। শয়তান তখন রাজ্যের পশু পাখি রান্না করে জোহাককে খাওয়াতে লাগল। সুস্বাদু খাবার খেয়ে

জোহাকের লোভ বেড়ে গেল। সে শয়তানকে আরো সুস্বাদু খাবার রান্না করার জন্য বলতে লাগল। শয়তান তখন অবাধে প্রাণী হত্যা করে জোহাকের সামনে হাজির করতে লাগল। ফলে দেশের পশু পাখি নিঃশেষ হয়ে এল। জোহাক কিন্তু খুশী হয়ে শয়তানকে বলল : তোমার এত সুন্দর রান্না খেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।

শয়তান এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। সে তখন খুব বিনয় করে বলল : হুজুর আপনি আমার রান্না খেয়ে খুশি হয়েছেন দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনার কাছে অমি কিছু চাইনা। তবে…

: তবে কি? যা চাও তাই পাবে। কি চাও বল?

: আপনার দুই কাঁধে যদি দুটো চুমু দেবার অধিকার আমাকে দেন, তাহলে আমার আশা পূর্ণ হয়।

শুনে জোহাক বলল : নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। শয়তান তখন জোহাকের দুই কাঁধে চুমু দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেল। জোহাকের দুই কাঁধ থেকে দুই প্রকাণ্ড অজগর বেরিয়ে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

ওদিকে চোখের নিমেষে শয়তান সেখান থেকে উধাও হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজার রক্ষীরা তরবারির আঘাতে সাপ দুটোকে কেটে ফেলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধে আবার সাপ গজিয়ে উঠে আস্ফালন করতে লাগল।

অজগরের ভয়ে লোকজন সব কোথায় ছুটে পালাল। জোহাকও খুব ভয় পেয়ে গেল। ওঝা এল অনেক। তারা এসে ঝাড় ফুঁক দোওয়া তাবিজ করল। কিন্তু সাপ অনড়। জোহাকের কাঁধে বসে সমানে আস্ফালন করতে লাগল, আর তাকে কামড়াতে লাগল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় ওঝার ছদ্মবেশে শয়তান সেখানে হাজির হল। সে এসে মন্ত্র পড়ার ভান করল কিন্তু তাতে কিছু হল না। সে তখন বলল : অজগরগুলো শয়তানের চেলা। কেউ ওদের সরাতে পারবে না। তবে খাদ্য দিয়ে শান্ত রাখলে ওরা কাউকে কামড়াবে না।

জোহাক একটু স্বস্তি পেয়ে জিজ্ঞাসা করল : কি খাদ্য দিলে ওরা শান্ত থাকবে?

: মানুষের মগজ। রোজ দুটো মানুষের মগজ অজগর দুটোকে খেতে দিলে ওরা আর কাউকে কিছু বলবে না।

জোহাক বলল : তাই হবে।

জোহাকের কথা শুনে শয়তান অদৃশ্য হল। জোহাকের লোকেরা রোজ দুটো মানুষ ধরে এনে তাদের মগজ দিয়ে অজগরের ক্ষুধা নিবারণ করতে লাগল।

শয়তানের এই হীন ষড়যন্ত্রে দেশে হাহাকার পড়ে গেল। জোহাকের অত্যাচারে এতদিন তারা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এখন আবার জালিম তাদের অজগরের মুখে ঠেলে দিতে লাগল। এই অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের আহাজারীতে চারদিক ভরে গেল। এক নয়, অনেক বছর ধরে চলল জালিমের এই অত্যাচার। অন্যায় শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে লাগল ইরানের সাধারণ মানুষ।

সর্পস্কন্ধ জোহাকেরও মনে শান্তি ছিল না। সাপের ভয়ে সে ঘুমাতে পারত না। প্রায়ই সে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত। একরাতে সে ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। সে দেখল তিনজন সৈনিক তাকে আক্রমণ করেছে। তার মধ্যে কম বয়সী এক বালক ভীমকায় এক গদার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে ও পাহাড়ের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই স্বপ্ন দেখে জোহাক ভয়ানক চীৎকার করে জেগে উঠল। চীৎকারে সারা প্রাসাদ কেঁপে উঠল।

স্বপ্নের অর্থ বুঝবার জন্য জোহাক অস্থির হয়ে রাজ্যের জ্ঞানী গুণী কবি দার্শনিক ও জ্যোতিষীদের তলব করল। রাজার স্বপ্নের অর্থ অনেক জ্যোতিষী বুঝতে পারল। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলল না। শেষে জুলুমের মুখে দেশের বড় জ্যোতিষী এগিয়ে এল। সে বলল--

: মহারাজ, সত্য কথা বলার জন্য তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারো। তাতে আমি ভয় পাই না। কারণ মরতে তো একদিন

হবেই। তোমার স্বপ্নের অর্থ হল এই—তোহমুরস বংশের আবতীনের এক পুত্র ফারেদুন তোমাকে গদার আঘাতে ধরাশায়ী করে টেনে নিয়ে পাহাড়ে ফেলে দেবে। তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

জ্যোতিষীর কথা শোনা মাত্র জোহাকের আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। সে চারিদিকে জল্লাদ পাঠাল তোহমুরস বংশের সব্বাইকে শেষ করার জন্য। জল্লাদরা নির্বিচারে তোহমুরসদের কোতল করতে লাগল। তাঁরা আবতীনকে হত্যা করে তার মগজ জোহাকের অজগরদের খাওয়াল। চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গেল। তোহমুরসরা বনে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে লাগল।

শিশু ফারেদুনকে বাঁচাবার জন্য মা ফরানক তাকে কোলে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করল। যেতে যেতে বনরক্ষকের সাথে তার দেখা। তখন মা বনরক্ষকের হাতে শিশুকে লুকিয়ে রাখার জন্য সমর্পণ করল।

শিশু ফারেদুন বনরক্ষকের কাছে তিন বছর রইল। তারপর ফারানক তাকে নিয়ে আল্‌বুর্জ পাহাড়ে এক দরবেশের আশ্রয়ে গিয়ে রইল। দরবেশ শিশুকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করতে লাগল।

ওদিকে জোহাক যখন জানতে পারল যে ফারেদুন বনরক্ষকের কাছে মানুষ হচ্ছে, সে তখন সেই বন জ্বালিয়ে দেবার হুকুম দিল। জালিম সেনারা গিয়ে বনে আগুন লাগিয়ে দিল। বনের গাছপালা পশুপাখি সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। বনরক্ষককেও প্রাণ দিতে হল সেই আগুনে। জালিম সেনারা কিন্তু ফারেদুনকে খুঁজে পেল না। জোহাক ভাবল ফারেদুন পুড়ে মারা গেছে।

আল্‌বুর্জ পাহাড়ে দরবেশের আশ্রয়ে ফারেদুন বড় হতে লাগল। দেখতে দেখতে ষোলটি বৎসর পার হয়ে গেল। ফারেদুন পাহাড়ের উপর থেকে উপত্যকায় নেমে এল। একদিন সে তার মায়ের কাছে প্রশ্ন করল, মা, আমার পিতা কে? আমাদের বাড়ি কোথায়? আমরা এখানে কেমন করে এলাম?

ফারানক তখন ফারেদুনকে তাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সব খুলে বলল।

মায়ের মুখে সব কথা শুনে ফারেদুন রেগে আগুন হল। সে তখন মাকে বলল—

: সিংহ কখনও তার শৌর্যের পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারে না। আমি এখনই গিয়ে জালিম জোহাকের মস্তক চূর্ণ করব। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।

শুনে ফারানক বলল, তুমি আর একটু বড় হও। আর কিছু দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।

ফারেদুনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ওদিকে জোহাকের কিন্তু দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। জালিম তখন জনপ্রিয়তার শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাইল। "বাদশা সৎ কাজ ছাড়া আর কিছুই করে না।" —এমনি এক অঙ্গীকারনামা লিখে সে দেশের গণ্যমান্য লোকদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিল। অত্যাচারের ভয়ে ভীরু লোকেরা নিঃশব্দে স্বাক্ষর দিল মিথ্যা দলিলে। দেশের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। অত্যাচারে অত্যাচারে জনজীবন একেবারে সহ্য সীমার বাইরে চলে গেল। অজগরের খোরাক হয়ে দেশের লোক প্রায় সাবাড় হয়ে গেছে। এখন প্রতি ঘর থেকে রোজ দুজন করে ধরে আনতে লাগল অজগরের ভোজের জন্য।

একদিন কাওয়া নামক এক কর্মকারের দুই জোয়ান ছেলেকে জোহাকের সৈন্যরা ধরে নিয়ে এল অজগরের খোরাকের জন্য। কাওয়া ছিল অত্যন্ত সাহসী ও বলবান। সৈন্যদের পিছে পিছে ছুটতে ছুটতে এসে সে রাজবাড়িতে ঢুকে একেবারে জোহাকের সামনে হাজির হল। সে রেগে জোহাককে বলল—

: হুজুর আপনি দেশের রাজা। আপনার কর্তব্য দেশের লোকদের রক্ষা করা। তা না করে আপনি তাদের হত্যা করছেন। আপনি আমার পুত্রদের ছেড়ে দিন।

জোহাক তখন কাওয়াকে মিথ্যা সেই ঘৃণিত দলিলে স্বাক্ষর করতে বলল—

: এই কাগজখানা সই করে দাও, তাহলে তোমার ছেলেদের ছেড়ে দেব।

: কিছুতেই তোমার এই মিথ্যা দলিলে আমি সই করব না— বলে কাওয়া সেই কাগজখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জোহাকের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে এল। সে চীৎকার করতে করতে বাজারের দিকে গেল ও সবাইকে বলতে লাগল— "জালিমের বিরুদ্ধে এক হও। জোহাকের পতন চাই।"

কাওয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে দলে দলে লোক এসে সংগঠিত হল। রাজার স্বপ্নের কথামত বিদ্রোহীরা ফারেদুনকে খুঁজতে লাগল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে ফারেদুনই দুশমন জোহাকের পতন ঘটাতে পারে।

ওদিকে আলবুর্জ পাহাড়ের মুক্ত হাওয়ায় ফারেদুন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। তার শরীরে যেমন ছিল বল তেমনি ছিল অপরূপ রূপ। মায়ের মুখ থেকে পিতৃহন্তার নাম শোনার পর থেকে তার দিন রাত্রির ভাবনা হল জোহাককে কি করে তিনি নিধন করবেন। একথা ভাবতে ভাবতে একদিন তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন : জোহাককে পরাস্ত কর। ইরানকে মুক্ত কর।

দৈবনির্দেশে ফারেদুন যুদ্ধবিদ্যা শিখতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অসীম শক্তিধর যোদ্ধারূপে পরিগণিত হলেন। ফারেদুন আর বেশিদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলেন না। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন একাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন জোহাকের সন্ধানে। মা ফরানক তাঁকে চোখের পানিতে সিক্ত করে বিদায় দিলেন।

জোহাকের উদ্দেশ্যে কিছুদূর যেতে না যেতে কাওয়ার বিদ্রোহী সেনাদলের সাথে ফারেদুনের দেখা হল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট সেনাদল তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিল। কারণ তারা জানত যে ফারেদুনই ইরানের ত্রাণকর্তা ও মুক্তি দাতা। ফারেদুন সানন্দে সেই বিশাল সেনাদলকে পরিচালিত করলেন জোহাকের

প্রাসাদের দিকে।

ফারেদুনের সৈন্যরা যখন নিকটে এসে গেল, জোহাক তখন নিরুপায় হয়ে শয়তানকে স্মরণ করল, শয়তান তখন তাকে বাগদাদের মায়াপুরীতে আশ্রয় নিতে বলল। জীন পরীরা পাহারা দেয় সেই মায়াপুরী। কোন মানুষের সাধ্য নেই সেই পুরীতে প্রবেশ করে।

বাগদাদের পথে পড়ল খরস্রোতা বিশাল দজলা নদী। নদী তো নয় যেন সাগর। নদী পার না হয়ে বাগদাদ যাবার কোনই পথ নেই। নৌকার খোঁজ করে বহুকষ্টে নৌকা পাওয়া গেল কিন্তু নদী রক্ষক কোন নৌকা ব্যবহার করতে দিল না। ফারেদুনের সেনারা খুবই ভদ্র ছিল, তাই তারা জোর জবরদস্তি করল না।

আল্লাহর নাম নিয়ে ফারেদুন ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেনারাও ঘোড়াসমেত নদীতে নেমে পড়ল। আল্লাহর মহিমায় নদীর পানি ঘোড়ার পায়ের উপরে উঠল না। রণোন্মত্ত সেনাদল নিয়ে মহাবীর ফারেদুন দজলা পার হয়ে অবলীলাক্রমে মায়াপুরীতে প্রবেশ করলেন। জীন পরীরা তার ভয়ে পালিয়ে যেতে দিশে পেল না।

জোহাক কৌশলে পালিয়ে গেল। ফারেদুন মায়াপুরী দখল করছে চরের মুখে এই খবর পেয়ে জোহাক চোরাপথে প্রাসাদে প্রবেশ করে ঘুমন্ত ফারেদুনকে হত্যা করতে উদ্যত হল।

আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন কেউই তাকে মারতে পারে না। আল্লাহর কৃপায় ফারেদুন জেগে উঠলেন। জোহাককে জল্লাদের মতো সামনে দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন ও গোমুখ অঙ্কিত ভীষণ গদা হাতে জোহাকের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। এমন সময়ে আকাশ থেকে দৈববাণী শোনা গেল—

"ফারেদুন দ্বিতীয় আঘাত কোর না, সংযত হও, ওর এখনও মৃত্যুর সময় হয়নি। ওকে টেনে নিয়ে পাহাড়ে শক্ত করে বেঁধে রেখে এসো। তারপর দামাওন্দ অগ্নিগিরের মধ্যে নিক্ষেপ কর।

যেখানে সে অনন্ত কাল ধরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করুক।'

দৈববাণীর কথা মত ফারেদুন জোহাককে টানতে টানতে পাহাড়ে নিয়ে বেঁধে রাখলেন। তারপর তাকে দামাওন্দ অগ্নিগিরির গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন।

এভাবে ইরান থেকে জালিমশাহীর পতন হল। জনগণের দুঃখ রজনীর অবসান হল। অত্যাচারী জোহাকের সমস্ত চিহ্ন ইরান থেকে মুছে ফেলা হল। ইরানের ঘরে ঘরে নামল তখন খুশির জোয়ার।

ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতার সাথে ফারেদুন ইরান শাসন করতে লাগলেন। শয়তানের দাস জোহাককে পরাজিত করে তিনি ইরানকে কলুষমুক্ত করলেন। পিতার হত্যার প্রতিশোধের সাথে সাথে তিনি সকল অন্যায় দমন করেছিলেন। ফারেদুনের প্রচেষ্টায়, অন্যায় অত্যাচার থেকে দুর্বলেরা রক্ষা পেল। তারা প্রাণ খুলে দোওয়া জানাল তাদের নেতাকে।

দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর বৃদ্ধ ফারেদুন পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। সলম, তুর ও ইরিজ নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল। এদের মধ্যে যাতে হিংসার দ্বন্দ্ব বা স্বার্থের হানাহানি না বাধে সেইজন্য বিচক্ষণ সম্রাট তিন পুত্রের মধ্যে তার বিশাল সাম্রাজ্য সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"একজনকে দিলেন রোম ও পশ্চিম এলাকা, অন্যকে তুর্কীস্তান ও চীন, তৃতীয় জনকে দিলেন দিগন্তবিস্তারী প্রান্তরসহ ইরান ভুমি।'

তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র ইরিজকে "তাজ, তখ্‌ত, তলোয়ার ও রাজ অঙ্গুরীয়" দিয়ে বাদশা তার সাথেই রইলেন। আর তাতেই বাধল গোলমাল।

এ পর্যায়ে শাহনামায় বর্ণিত দেশগুলি সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়া দরকার।

শাহনামায় 'রোম' বলতে সিরিয়া, তুরস্ক বা ইরাকের উত্তরাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে ধরে নিতে হবে। তুরান বা

তুর্কীস্তান বলতে মধ্য এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান, কাজাকিস্তান, বোখারা ও সমরখন্দ এলাকাকে ধরা হয়েছে। এই মহাকাব্যে চীন বলতে কখনও মূল চীন ভূখণ্ডকে, কখনও মধ্যে এশিয়ার সীমান্তবর্তী কাশগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি জনপদকে বুঝানো হয়েছে।

যা হোক, বাদশা ফারেদুন তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য সমান ভাগ করে দিয়েও স্বস্তি পেলেন না। কারণ ইরান ধনে-জনে শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধিশালী দেশ। তাই বড় দুভাই ইরিজকে হিংসা করতে লাগল। কি করে ইরিজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা ইরান দখল করতে পারে—এটাই ছিল তাদের ষড়যন্ত্রের মূল কথা। স্থির হল যে তারা দুভাই ইরিজকে তাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ করবে। সেইমত তারা দূত পাঠাল ইরানে।

নিষ্পাপ ইরিজ সানন্দে ভাইদের কাছে গেল। ভাইরা তাকে বিদ্রূপ করে বলল—"তুমি তো আমাদের ছোট তা তুমি রাজমুকুট পরেছ কেন?

উত্তরে ইরিজ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল—"রাজত্ব ও রাজমুকুট চিরস্থায়ী নয়, সবই একদিন মিশে যাবে। আমার মুকুট আপনাদের আমি সমর্পণ করতে প্রস্তুত আছি।"

ইরিজের এই বিনয়পূর্ণ কথায় হিংসায় উন্মত্ত ভাই তুর-এর মন ভিজল না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বর্ণ আসন তুলে ইরিজের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল ও তরবারির আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করল। ভ্রাতাকে হত্যা করে তারা ক্ষান্ত হল না। বেইমান ভ্রাতৃহন্তারা তখন ইরিজের ছিন্ন মস্তক বৃদ্ধ পিতার কাছে পাঠিয়ে দিল। এই দৃশ্য দেখে ফারেদুন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সারা রাজ্যে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া।

পরবর্তীকালে এই রক্তের প্রতিশোধই ইরান তুরানের মধ্যে শুত্রুতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই শত্রুতাই যুগ যুগ ধরে ইরানে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে। আজও তার শেষ হয়নি। শাহনামার এই অংশে 'জাল ও রুদাবা' 'সোহরাব-রোস্তম' 'সিয়াউশ', 'বেঝন মুনীঝা' এবং রোস্তমের শৌর্যমূলক বিচিত্র কাহিনী যুগে যুগে ইরান তথা বিশ্ববাসীকে দেশপ্রেম ও ন্যায় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বৃদ্ধ শোকাহত সম্রাট ফারেদুন প্রিয়তম পুত্র ইরিজের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলেন। ইরিজের বিধবা পত্নী মাহআফরিদ তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ফারেদুন আশা করলেন যে ইরিজের পুত্র পিতার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কিন্তু মাহআফরিদের গর্ভে জন্ম নিল এক কন্যা-সন্তান। নাম তার পরী চেহের। সম্রাট সাময়িকভাবে আশাহত হলেও নিরাশ হলেন না। পরম স্নেহে পৌত্রীকে লালন পালন করে জমশেদ বংশীয় এক অভিজাত তরুণের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। পরী চেহেরের গর্ভে একদিন জন্ম নিল বিখ্যাত ইরানী বীর মনু চেহের।

বৃদ্ধ ফারেদুন মনু চেহেরকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মানুষ করতে লাগলেন। একটু বড় হলে তাকে অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। ক্রমে ক্রমে মনু চেহের এক বিরাট সেনাদল সংগ্রহ করে মাতামহহন্তা তুর ও সলমের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি নিজে দীর্ঘ সময় ধরে সমর কৌশল অনুশীলন করতেন ও প্রতিটি সেনাকেও

কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রেরণা দিতেন।

ওদিকে তুর ও সলম কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকতে পারেনি। ইরানের খবর দূতের কাছ থেকে তারা সব সময় সংগ্রহ করছিল। প্রথম দিকে মনু চেহেরের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পরে তার বিরাট সেনাদলের কথা অবহিত হল, তখন তুর ও সলমের সম্মিলিত বাহিনী মনু চেহেরের বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করল। তারা প্রবল বিক্রমে আমুদরিয়া নদী পার হয়ে ইরান সীমানায় প্রবেশ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলল।

ফারেদুনের আদেশে প্রখ্যাত সেনাপতিগণসহ মনু চেহের তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। উভয় পক্ষে শুরু হল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

অযথা নরহত্যা না করে মনু চেহের প্রতিদ্বন্দ্বী তুর ও সলমকে খুঁজতে লাগলেন। সারাদিন চেষ্টা করেও মনু চেহের তাদের দেখা পেলেন না। রাতে অতর্কিতে তুর ও সলম মনু চেহেরকে আক্রমণ করল। চোখের নিমেষে মনু চেহের তুর-এর উপর পাল্‌টা আঘাত করলেন। তুর-এর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তুর-এর মৃত্যু দেখে সলম ভয় পেয়ে আলানা দুর্গে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল।

পালিয়ে গিয়েও সলম রেহাই পেলেন না। মনু চেহের সেখানে গিয়ে অচিরে তাকে হত্যা করলেন। এভাবে মাতামহ ইরিজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে মনু চেহের ইরানের সিংহাসনে বসলেন।

ওদিকে পরলোকের ডাক এসে গেল বৃদ্ধ ফারেদুনের। নাতিকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে প্রজাদের সন্তানের মত স্নেহ করতে বলে তিনি অমরলোকে যাত্রা করলেন।

বাদশা মনু চেহের নিজে ছিলেন মহাবলশালী। তাঁর সেনাদলেও ছিল অসংখ্য বীর পালোয়ান। অত্যাচারী জোহাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হোতা কর্মকার কাওয়া ও তার দুই পুত্র ছাড়াও শাহপুর, নরীমান, নরীমানের পুত্র সাম ও আদশির প্রভৃতি বিখ্যাত বীর যোদ্ধা মনু চেহেরের সেনাদের পরিচালনা করতেন,

যাদের পদভারে ধরণী টলমল করত। যাঁদের বীরত্বের অমর কাহিনী যুগে যুগে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে সাহস ও শৌর্য দান করে আসছে। মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করে গেছেন। তাই তাঁরা ইরান তথা পৃথিবীর মানুষের কাছে চিরকাল অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন।

মনু চেহেরের সেনাপতিদের মধ্যে নরীমান পুত্র সাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। শৌর্যে বীর্যে সাম ছিলেন সত্যিই অতুলনীয়। তার বীরত্বের কাহিনী দেশ বিদেশের লোকের মুখে মুখে শোনা যেত।

সামের কোন সন্তান ছিল না বলে তার মনে শান্তি ছিল না। তিনি সবসময়ে আল্লাহর কাছে পুত্র কামনা করতেন। পুত্র সন্তান হলে তাকে নিজের মত বলশালী যোদ্ধারূপে গড়ে তুলবেন এই ছিল তার সর্বক্ষণের কামনা।

দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর সামের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। কিন্তু দেখা গেল যে তার মাথার চুল থেকে চোখের ভুরু পর্যন্ত সবই দুধের মতো সাদা। পুত্রকে দেখে বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। তার মনে হল এ সন্তান আহরিমান বা শয়তানের বংশজাত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাও শিশুর দেহের এই লক্ষণকে অশুভ বলে মনে করল। তারা পরামর্শ দিল এই অশুভ লক্ষণযুক্ত পুত্রকে ঘরে রাখা ঠিক হবে না।

নির্দয় এক চিন্তা সামের মাথায় এল। পুত্র 'জাল'কে তিনি অরণ্যে বিসর্জন দেবার কথা স্থির করলেন। শিশু জালকে নিয়ে আলবুর্জ পাহাড়ের শিখরে গভীর অরণ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করা হল। এই নির্দয়তার জন্য সাম বিশ্বপ্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

সেই সময়ে অরণ্যঘেরা আলবুর্জ পর্বতের শিখরে সী-মোরগ নামে এক ধরনের বিরাটকায় পাখি বাস করত। এই পাখির অর্ধেক শরীর দেখতে পাখির মত। বাকিটা দেখতে পশুর মত। বিরাটকায় এই সী-মোরগের পাখাও ছিল বহুদূরবিস্তারী। পাখি হলেও সী-মোরগদের বুদ্ধি ছিল মানুষের মত। আরও আশ্চর্যের

বিষয় এই যে এরা মানুষের ভাষা বুঝত ও মানুষের সাথে কথা বলতে পারত।

বিধির কি কৃপা। এমনি এক সী-মোরগ শিশু জালকে অরণ্যের মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে দয়া করে শিশুটিকে পাহাড়ের চূড়ায় তার বাসায় নিয়ে গেল। আর মানব শিশু জালকে নিজের শাবকদের সাথে পরম যত্নে প্রতিপালন করতে লাগল।

পুত্রকে পরিত্যাগ করে ওদিকে সাম-এর মনে শান্তি ছিল না। যতদিন কাটতে লাগল ততই তার মনে পিতৃ স্নেহ উথলে উটতে লাগল। ক্রমে তিনি শিশুকে ফিরে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। সব দিকে তিনি লোক পাঠালেন শুভ্রকেশি শিশুটিকে খুঁজে বের করার জন্য। মনের এই অসম্ভবরকম অস্থির অবস্থায় এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যেন ফেরেশতা তাকে বলছেন— "সাম তোমার পুত্র এখনও বেঁচে আছে। তুমি নিরাশ হয়ো না।"

ফেরেশতার বাণী শুনে সাম আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু কেউই তাঁকে খুঁজে পেল না। সাম তখন নিজেই জালের সন্ধানে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি আলবুর্জ পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যেখানে জালকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল সেখানে বসে তিনি মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নায় বিধাতার দয়া হল। আল্লার মহিমায় দয়ালু সী-মোরগ যুবক জালকে নিয়ে সামের সামনে উপস্থিত হল।

পুত্রকে ফিরে পেয়ে সাম যে কি খুশী হলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খোদার কাছে তিনি শোকরানা জানালেন। আর শোকর জানালেন সেই ধাত্রীরূপী পাখিকে। তারপর পুত্রকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। বিদায় নেবার সময়টা ছিল অত্যন্ত করুণ। পাখি-মাকে ছেড়ে আসতে জালের বুক ফেটে যাচ্ছিল বেদনায়। এতদিনের লালিত স্নেহের ধনকে ছেড়ে দিতে পাখি-মারও প্রাণে সহ্য হচ্ছিল না। তার চোখ দিয়ে অঝোরে ধারা নামল। বীর যুবক জালও অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। সামের চোখ থেকেও নিঃশব্দের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিদায়ের সময় সী-মোরগ জালকে তার পাখার একটা পালক দিয়ে বলল—"যদি কখনও কোন বিপদে পড় এই পালকটা আগুনের কাছে ধরলেই আমি তোমার কাছে হাজির হব।"

স্নেহময়ী পক্ষী-মাতার এই দান জাল মহাসম্পদরূপে নিজের কাছে রেখে দিলেন। জালের পুত্র মহাবীর রুস্তমও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সেই পালক। প্রয়োজনের সময় পালক উত্তপ্ত করে সী-মোরগের সাক্ষাৎও পেয়েছিলেন তিনি।

জালকে বিদায় দিয়ে সী-মোরগ তার দিগন্তজোড়া পাখা বিস্তার করে আকাশে উধাও হয়ে গেল। সাম হারানো ধন জালকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। জালকে ফিরে পেয়ে সামের আনন্দের অবধি রইল না। তাকে ঘিরে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে গেল পিতৃগৃহে। যথাসময়ে সাম জালকে নিয়ে মনু চেহেরের দরবারে হাজির করলেন। সী-মোরগ পাখির উপকারের কথা তিনি বাদশাকে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। জালের বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখে বাদশা খুব খুশী হয়ে তাকে অনেক উপঢৌকন দিলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য এক সেনাবাহিনীর নায়করূপে তাকে জাবলিস্তানে প্রেরণ করলেন। সামও পুত্রের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য তার অনুগামী হলেন।

কালক্রমে জাল জাবলিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন ও বিচক্ষণভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সে দেশ শাসন করতে লাগলেন। একবার জাল কাবুলে গিয়েছিলেন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে। কাবুলের রাজকন্যা মেহরাবের কন্যা রূদাবাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি গ্রহণ করেন।

রূদাবাকে নিয়ে জাল দেশে ফিরে পরম সুখে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু রূদাবা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাঁচার কোন আশা রইল না। এই বিপদের সময় জালের মনে পড়ল সী-মোরগের কথা। তিনি তখনই সেই পালকটা আগুনের কাছে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সী-মোরগ সেখানে এসে উপস্থিত হল ও বনৌষধির সাহায্যে রূদাবাকে সুস্থ করে তুলল।

যাবার সময় সী-মোরগ জালকে বলল—রূদাবা অত্যন্ত সুলক্ষণা। তাকে খুব যত্ন করে রাখবে। এ হবে তোমার এক ভুবনবিজয়ী পুত্রের মাতা। তার বীরত্বের কাহিনী সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত হয়ে থাকবে।

কিছুদিনের মধ্যেই রূদাবার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। সেই সন্তানই বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর রোস্তম।

'নবজাত শিশু যেন সিংহসদৃশ একবার বীর, যেমন সে দীর্ঘ তনু কেমন প্রশস্ত রক্ষ'—শিশু রোস্তমের বর্ণনা দিয়েছেন মহাকবি ফেরদৌসী। এমন বিশালবপু নবজাতক কেউ কোনও দিন দেখেনি। মা রূদাবা শিশুর নাম রাখলেন রোস্তম। রোস্তম শব্দের অর্থ শিরোত্তোলন করা। শিশু জন্মাবার পর রেশমী বস্ত্রের উপর সুতো দিয়ে শিশুর এক প্রতিকৃতি রচনা করে পিতামহ সামের কাছে পাঠানো হল। প্রতিকৃতিতে দেখানো হয়েছে শিশুর এক হাতে বর্শা ও গদা, অন্য হাতে সজোরে শ্বেত অশ্বের বল্গা ধারণ করা।

এই সুসংবাদ পেয়ে সামের মনে খুশির অন্ত রইল না। কাবুলিস্তান থেকে জাবলিস্তান পর্যন্ত সর্বত্র উৎসবের সমারোহে মুখর হয়ে উঠল। মাতামহ মেহেরাবের মনেও আনন্দ আর ধরে না। খুশী হয়ে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করলেন রাশি রাশি।

শিশু রোস্তম দেখতে যেমন বিশাল তার ক্ষুধাও তেমনি প্রচুর। তাই তার জন্য স্তন্যদাত্রী ধাত্রী রাখা হল দশজন। ক্রমে যখন তার খাওয়ার বয়স হল, তখন তার জন্য প্রতিদিন পাঁচটা করে খাসী জবাই করা হত। তার সাথে রুটি ফলমূল তো থাকতোই। ইরানের রীতি অনুসারে খুব ছোট বয়স থেকেই রোস্তম ঘোড়ায় চড়া, গদা ও বর্শা চালনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন।

খুব কম বয়সে রোস্তম একদিন পাগলা এক হাতী মেরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। রাত্রে তখন সবাই ঘুমে। রোস্তমও ঘুমের মধ্যে কিসের কোলাহল শুনে জেগে ওঠে দেখেন, মত্ত

হাতী জিঞ্জির ছিঁড়ে নগরে বেরিয়ে গিয়ে মানুষজন পায়ের তলে পিষে ঘর বাড়ি বিচূর্ণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। পিতামহের দেওয়া গদা হাতে নিয়ে রোস্তম পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ও গর্জন করতে করতে ছুটে আসা হাতীর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন ও গদার আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। তার পর গিয়ে তিনি নিদ্রামগ্ন হলেন।

পিতা জাল পরদিন পুত্রের এই অসীম সাহসের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, 'হে বালক বীর, বীরত্বে, বিক্রমে ও সমুন্নতিতে তুমি তুলনাহীন। এখন তুমি অগ্রসর হও সামনের দিকে, তোমার প্রপিতামহ নুরীমানের রক্তের প্রতিশোধে।'

অনেক দিন আগে সামের পিতা নুরীমান সিপন্দের পাহাড়ী দুর্গ জয় করতে গিয়েছিলেন। সেই দুর্গ ছিল মায়াজালে সমাচ্ছন্ন। এক বছর ধরে চেষ্টা করেও নুরীমান সেখানে পৌঁছতে পারলেন না। তবে তার সাথে লড়াই করেও সিপন্দের মায়াবী দৈত্যরা পেরে উঠছিল না। তাদের পরাজয় যখন আসন্ন তখন তারা দুর্গের উপর থেকে বিশাল এক পাথর গড়িয়ে দিল বীর নুরীমানের দিকে লক্ষ্য করে। তাতেই তার জীবনাবসান হল।

এর পর মহাবীর সাম সিপন্দের দিকে অভিযান চালালেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশের পথ তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না। পিতৃশোণিতের প্রতিশোধ নিতে তিনি বিফল হয়ে ফিরে এসেছিলেন। জাল রোস্তমকে উষ্ট্রচালকের বেশে এক কাফেলা নিয়ে সিপন্দে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। রোস্তম উটের পিঠে লবণ বোঝাই করে নিয়ে গেলেন। কারণ সেই পাহাড়ী অঞ্চলে লবণ পাওয়া যেত না, লবণের মধ্যে তিনি লুকিয়ে নিলেন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

দুর্গের প্রহরীরা পরীক্ষা করে দেখল কাফেলা লবণ ছাড়া আর কিছু বহন করছে না, তাই তারা তাদের দুর্গে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। রোস্তম পণ্যবাহী কাফেলা নিয়ে বাজারে গিয়ে তাঁবু খাটালেন ও সারাদিন ধরে সেখানকার লোকজনের কাছে লবণ বিক্রয় করলেন, তারপর রাতের অন্ধকারে দুর্গ আক্রমণ

করলেন। দুর্গরক্ষক কোতয়াল সর্বশক্তি নিয়ে রোস্তমের দিকে ধাবিত হলে রোস্তম তাকে তাঁর ভয়ঙ্কর প্রহরণ দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেললেন। চারিদিক থেকে তখন সৈন্য এসে রোস্তমের উপর চড়াও হল। কিন্তু রোস্তমের গদার সামনে কেউই টিকতে পারল না। ভোর হবার আগেই দুর্গের সমস্ত সেনা তিনি খতম করলেন। তারপর তিনি সিপন্দের ধনাগারে প্রবেশ করে প্রচুর ধনরত্ন ও মণিমুক্তা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এইভাবে বালক বয়সে পিতৃপুরুষ নুরীমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার বীরত্বপূর্ণ জীবনের সূত্রপাত হল।

ওদিকে বাদশা মনু চেহেরের বয়স একশ বিশ বছর হল। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তিনি তার পুত্র নওজরকে সম্রাটের বহু বিস্তৃত কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে শান্তিপ্রিয় ইরানবাসীকে রক্ষা করার জন্য উপদেশ দিয়ে পরলোক গমন করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর নওজর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু বেশি দিন যেতে না যেতে তার অন্যায় উৎপীড়নে দেশে হাহাকার পড়ে গেল। 'তিনি অবিলম্বে পিতার নীতি নিয়ম থেকে সরে দাঁড়ালেন। এবং জ্ঞানী ও গুণীজনদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পৌরুষ তার হাতে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হল, মর্যাদা পেল শুধু স্বর্ণ ও সম্পদের রাশি।'

বাদশাহের অত্যাচারে সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহের আলামত দেখা গেল। ভীত হয়ে বাদশা মহাবীর সামকে ডেকে পাঠালেন। সাম তখন মাজিন্দিরানে সাকসারদের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলেন। বাদশাহের লিপি পেয়ে সাম কিরগিজ অঞ্চল থেকে বের হয়ে ইরানের দিকে ছুটে এলেন। তাকে দেখে দলে দলে ইরানী সেনা এসে তাকে সিংহাসনে আরোহণ করতে বলল। তাদের কথা শুনে মহাবীর সাম বললেন, 'আমার রাজমুকুট এই বংশেরই দান। কাজেই এই সিংহাসনে বসার কথা শোনাও আমার পাপ। আমি বরং বাদশাহকে সুপরামর্শ দিয়ে সুপথে পরিচালিত করব।' সামের পরামর্শে নওজরের স্বভাবের পরিবর্তন হল। কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তিনি দেশে সুশাসন প্রবর্তন করলেন। সকলে

সুখী হল। নিশ্চিন্ত মনে সাম মাজিন্দিরানে ফিরে গেলেন।

সাত বছর পার হল। এমন সময় ইরান আবার এক বিরাট সঙ্কটের মুখোমুখি হল। ফারেদুনের বিশ্বাসঘাতক পুত্র তুর যে রাজ্য স্থাপন করেন সেই তুরান থেকে তুরপুত্র পিশঙ্গ ইরান আক্রমণ করে বসলেন। তিনি তাঁর বীরপুত্র আফরাসিয়াবকে পাঠালেন ইরান জয় করার জন্য। তুর্কীস্তান ও চীন থেকে লক্ষ লক্ষ সেনা এসে আফরাসিয়াবের সাথে যোগ দিল।

বাদশা নওজর প্রমাদ গুনলেন। তিনি আবার মহাবীর সামকে স্মরণ করলেন। কিন্তু দুঃসংবাদ নিয়ে দূত ফিরে এল। সাম মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, এবং জাল পিতার অন্তোষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত।

এই সংবাদে আফরাসিয়াব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ঝটিকা গতিতে আক্রমণ হানলেন ইরানের উপরে। দুইপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। প্রচুর সৈন্য ও সেনাপতি হতাহত হল। বারমান, কোবাদ ইত্যাদি বীরগণ প্রাণ দিলেন একে একে। ইরানের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। অবশেষে বাদশা নওজর শত্রু আফরাসিয়াবের হাতে বন্দী হলেন।

ইরান দখল করার পর আফরাসিয়াব জাবলিস্তানের দিকে যাত্রা করল। জাল তখন পিতার সমাধি নির্মাণে ব্যস্ত। খবর পেয়ে তার শ্বশুর মেহেরাব তাকে শত্রু সৈন্যের উপস্থিতির কথা অবহিত করলেন। জাল এসে তুরানী সেনাপতি খজরওয়াকে যুদ্ধে নিহত

করলেন ও শসামাসকে রণভূমি ত্যাগে বাধ্য করলেন।

নামকরা বীরগণ নিহত হয়েছেন শুনে আফরাসিয়াব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বন্দী নওজরকে হত্যা করলেন। তারপর তিনি হৃদয়মন ঈর্ষা ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ করে ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

সারা ইরান থেকে হায় হায় ধ্বনি উঠল। শোকে অধীর হয়ে পরাক্রান্ত সামন্তগণ মহাবীর জালের কাছে গিয়ে প্রতিহিংসার বাসনা ব্যক্ত করলেন। জাল বীরপুত্র রোস্তমকে সেনাপতি করে তুরানী সেনার মোকাবেলা করতে পাঠালেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী হয়ে জাল মনে করলেন ইরানের সিংহাসন শূন্য রাখা ঠিক নয়। কেয়ানী বংশোদ্ভূত রাজা কায়কোবাদের খোঁজ করলেন তিনি। রোস্তম গিয়ে রাজা কায়কোবাদকে আলবুর্জ পাহাড়ের দুর্গম ও শত্রু এলাকা থেকে সসম্মানে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে ইরানের সিংহাসনে বসানো হল।

কায়কোবাদ আনন্দিতচিত্তে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। জাল ও রোস্তমের মত জগজ্জয়ী বীরগণ তার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করে রইলেন।

এবার আফরাসিয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। ইরানীয় বাহিনী শোণিতপাতের প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হল। সৈন্যদলের একপাশে রইলেন কাবুলরাজ মেহরাব অন্যপাশে রণকুশলী গুস্তাহাম।

মধ্যভাগ রক্ষা করে চললেন বীরপ্রবর কারেন, তারি সঙ্গে রইলেন শত্রুনিধনকারী কুশওয়াদ। সম্মুখভাগ রক্ষার ভার পড়ল অগ্রগণ্য বীরবৃন্দসহ শূর-শ্রেষ্ঠ রোস্তমের উপরে। ঠিক তাঁদেরই পিছনে প্রতিষ্ঠিত রইলেন কায়কোবাদসহ মহামতি জাল।

রোস্তম সওয়ার হলেন তার দুরন্ত অশ্ব রাখ্‌শের পিঠে। হাতে রইল তার পিতামহ সামের বিখ্যাত প্রহরণ। সেই প্রচণ্ড ভারী গদা ঘুরাতে ঘুরাতে মহাবীর সাম যখন যুদ্ধে নামতেন শত্রুরা তা দেখে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যেত।

পিতা জালের কাছ থেকে পিশঙ্গ-পুত্র আফরাসিয়াবের রণকৌশল সম্পর্কে অবহিত হয়ে রোস্তম সিংহনাদ করে তুরানী সৈন্যদলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আফরাসিয়াব দূর থেকে পাহাড় সদৃশ বালক রোস্তমকে দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি যখন জানলেন যে এই বালক সাম-নন্দন জালের পুত্র তখন তিনি সামনে এগিয়ে এলেন। রোস্তমও তার গুরুভার প্রহরণ নিয়ে আফরাসিয়াবকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। আফরাসিয়াব তরবারি চালিয়ে যেতে লাগলেন আত্মরক্ষার জন্য। রোস্তম এইবার তার পাঞ্জা প্রসারিত করে বজ্রমুষ্টিতে আফরাসিয়াবের কোমরবন্ধ ধরে টান দিয়ে তাকে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে শূন্যে তুলে নিলেন। রোস্তম ভাবলেন আফরাসিয়াবকে টেনে নিয়ে যাবেন কায়কোবাদের কাছে।

তখন তুরান রাজ ও রোস্তমের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়ে গেল। আফরাসিয়াবের কোমরবন্ধ টানাটানি সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে গেল। আফরাসিয়াব মাটিতে পড়ে গেলে রোস্তম তার মাথার মুকুট ছিনিয়ে নিলেন ও তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। আফরাসিয়াব দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তখন তুরানী মহারথীরা এসে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু রোস্তমের নেতৃত্বে ইরানী বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের মধ্যে। 'যুদ্ধে মহাবীর রোস্তম তরবারি, খঞ্জর, প্রহরণ ও পাশের দ্বারা যুগপৎ তুরানী বীরগণের শির, বক্ষ ও হস্তপদ কর্তন, বিদারণ ও বন্ধন করে চলেছিলেন অবলীলায়। এক একটি আক্রমণে তিনি নিধন করেছেন এক হাজার একশো ষাট জন প্রতিপক্ষকে।' অবশেষে তুরানীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। আফরাসিয়াব অনন্যোপায় হয়ে ইরানের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

বাদশা কায়কোবাদ দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে একশো বছর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করলেন। মৃত্যুকালে বাদশা জ্যেষ্ঠ পুত্র কায়কাউসকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেলেন।

কায়কাউস সিংহাসনে বসে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন পার্শ্ববর্তী দেশ মাজিন্দিরান থেকে এক গায়ক এসে তাকে সে দেশের সুখ সমৃদ্ধির কথা শুনিয়ে গেল। বাদশা কায়কাউস তখন মাজিন্দিরান জয় করার জন্য সৈন্য সাজাতে লাগলেন।

মাজিন্দিরান দৈত্যদের দেশ। তারা ইরানের চিরকালের শত্রু। সম্রাটের অভিপ্রায় শুনে সেনারা প্রমাদ গুনল। কায়কাউস তখন জালকে ডেকে পাঠালেন। জাল এসে বাদশাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন 'বাদশাহ জামশেদ, যাঁর অজ্ঞাবহ ছিল দৈত্য, বিহঙ্গম ও পরীদল, তিনিও কোনও দিন মাজিন্দিরান অভিযানের চেষ্টা করেননি। এমন কি ফারেদুন বা মনু চেহের ও-পথে যাবার চেষ্টা করেননি।'

জালের কথা শুনে কায়কাউস বললেন, 'আমি জামশেদ, ফারেদুন, মনু চেহের বা কায়কাউসের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী, তাই আমি মাজিন্দিরান অভিযান করবই করব।'

বাদশার কথা শুনে জাল দুঃখিত হয়ে সীস্তান গমন করলেন। কায়কাউস সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মাজিন্দিরান অভিমুখে রওনা হলেন। পথের সমস্ত নগর ও জনপদ তিনি ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চললেন। মাজিন্দিরানের দৈত্যরাজা একথা জানতে পেয়ে সেনাপতি সপেদ দৈত্যকে কায়কাউসকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য আদেশ করলেন। সপেদ দৈত্য দুর্গশীর্ষ থেকে প্রস্তর ও উপলখণ্ডের বারি বর্ষণ করতে করতে ইরানী সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। নিরস্ত্র নিরুপায় কায়কাউস সপেদ দৈত্যের হাতে বন্দী হলেন। তার অবশিষ্ট সেনারাও তার সাথে বন্দী হয়ে রইল।

বন্দী সম্রাট মহাবীর জালের কাছে লিপিকা পাঠালেন তাকে উদ্ধার করার জন্য। জাল তখন রোস্তমকে মাজিন্দিরান অভিযান চালাবার জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন 'তরবারি কোষবদ্ধ রেখে অবসর যাপনের সময় এ নয়, অবিলম্বে তোমার রাখ্‌শকে সজ্জিত কর। তোমার শৌর্যে আরঝঙ্গ, সপেদ দৈত্য ও

মাজিন্দিরান অধিপতির শির তোমারই গুরুভার প্রহরণের আঘাতে বিচূর্ণিত কর।'

পিতৃবাক্যে উদ্দীপ্ত হয়ে রোস্তম মাজিন্দিরান যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু পথ যে দীর্ঘ, সেখানে পৌঁছাতে তো ছয় মাস লেগে যাবে। ততদিনে বন্দী বাদশা হয়ত শোকে দুঃখে দেহত্যাগ করবেন। জাল তখন রোস্তমকে বললেন যে, সহজ পথ একটা আছে কিন্তু তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। সিংহ, দৈত্য ও ঘোর অন্ধকারে সমাকীর্ণ সে পথ দিয়ে মাত্র দু সপ্তাহে মাজিন্দিরান পৌঁছানো যায়। 'তবু আশীর্বাদ করি রাখ্‌শের পদতলে তুমি সে সব দলিত করবে।'

রোস্তম সহজ কিন্তু দুর্গম পথই বেছে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এবার শুরু হল তার সপ্ত সঙ্কটের পথে অভিযান। দিন-রাত্রি সমান গতিতে রাখ্‌শ ছুটে চলল। এক সন্ধ্যায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে রোস্তম একটি বন্য গর্দভ মেরে আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেন। তারপর রাখ্‌শের লাগাম খুলে তাকে পাহারায় রেখে বেণুবনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই বেণুবনে ছিল এক বিরাটকায় সিংহের আস্তানা। সিংহটা প্রথমে রাখ্‌শের দিকে ধাবিত হল। রাখ্‌শ আগুনের মত উত্তেজিত হয়ে সামনের দুই পা তুলে সিংহের মস্তকে এমনভাবে আঘাত করল যে সেই আঘাতে সিংহের মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল। হট্টগোলে রোস্তমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে দেখলেন রাখ্‌শের দুঃসাহসিক কাজ।

পরদিন ভোরে আবার তিনি রাখ্‌শের পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন। সামনে এল এক বিপদসঙ্কুল পথ। জলহীন বৃক্ষহীন দুস্তর মরুময় প্রান্তরে সৌরতাপ অত্যন্ত প্রখর। প্রচণ্ড তাপে তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে রাখ্‌শের শরীর অবশ হয়ে এল। রোস্তম অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে বর্শা হাতে এগিয়ে চললেন। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। এমন সময় একটা ভেড়া রোস্তমের সামনে দিয়ে চলে গেল।

তিনি ভেড়াটার পিছনে পিছনে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতে পেলেন এক জলাশয়।

বিশ্বপ্রভুর গুণগান করে রোস্তম সেই পবিত্র জলাশয়ে স্নান করলেন ও সেই স্নিগ্ধ পানি পান করে প্রাণ জুড়ালেন। তারপর তিনি আবার বন্য গর্দভ শিকার করে সেটাকে পুড়িয়ে সেই মাংস আহার করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করলেন।

তৃতীয় সঙ্কট শুরু হল মধ্যরাত্রে। রোস্তম ঘুমিয়ে আছেন এমন সময় আশি গজ দীর্ঘ এক আজদাহা (অজগর) তাকে আক্রমণ করতে এল। রাখ্‌শ ভীমবেগে দৌড়ে এসে মৃত্তিকায় পদাঘাত করে চীৎকার করে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। সেই ভয়ঙ্কর চীৎকারে রোস্তমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তরবারির এক মোক্ষম আঘাতে আজদাহার শির তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। পরম কৃতজ্ঞতায় রোস্তম বিশ্বপ্রভুর নাম উচ্চারণ করে নিদ্রাভিভূত হলেন।

পরদিন রোস্তম ঐন্দ্রজালিকের দেশে এসে চতুর্থ সঙ্কটের মুখোমুখি হলেন। এক জলাশয়ের ধারে রোস্তম বিশ্রাম করছিলেন। তখন এক সুন্দরী নারী এসে তার হাতে সুমধুর পানপাত্র দিল। রোস্তম পানপাত্র হাতে নিয়ে বিশ্বপ্রভুর নাম উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুহকিনী নারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রোস্তম সব বুঝতে পারলেন ও তরবারির আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

পরদিন রোস্তম এক মাঠের মধ্যে এসে পড়লেন, রাখ্‌শকে যবের ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন। এমন সময় সেই ক্ষেতের রক্ষক এসে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে চীৎকার করে বলল : বল কেন এই অশ্ব এই ক্ষেতে বিচরণ করছে?

এই কথা শুনেই রোস্তম লাফিয়ে উঠে লোকটার কান দুটো ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। খবর পেয়ে ক্ষেতের মালিক আওলাদ অনেক যোদ্ধা নিয়ে এল রোস্তমকে আক্রমণ করার

জন্য। তাদের কিছু করতে হল না। রোস্তমই তাদের সবাইকে খতম করলেন বীর বিক্রমে। তখন তিনি আওলাদকে বললেন : 'সপেদ দৈত্যের বাড়ি কোথায় আমাকে দেখাও, আর কায়কাউস কোথায় বন্দী হয়ে আছেন তাও আমাকে বল।'

আওলাদ প্রাণের ভয়ে রোস্তমের সহযোগিতা করতে রাজী হল। সে রোস্তমকে সাথে করে সপেদ দৈত্যের দুর্গে নিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে সে সপেদ দৈত্যের দুর্গ দেখিয়ে দিল রোস্তমকে। আওলাদকে এক বৃক্ষের সাথে পাশ দ্বারা শক্ত করে বেঁধে রেখে পিতামহের প্রহরণ হাতে নিয়ে রোস্তম এগিয়ে চললেন।

এবার ষষ্ঠ সঙ্কটের মুখোমুখি হলেন মহাবীর। সপেদ দৈত্যের দুর্গের প্রহরী আরঝঙ্গের সাথে বাধল তার ভীষণ লড়াই। রোস্তম দৈত্যের কেশ ও কর্ণ ধরে কেটে ফেললেন তার মস্তক। তাই দেখে অন্য সব দৈত্য ভয়ে পালিয়ে গেল। রোস্তম তখন আওলাদের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে কায়কাউসের বন্দীশালার দিকে গেলেন।

রাখ্‌শের বজ্রের মত হ্রেষা ধ্বনি শুনে কায়কাউস বুঝতে পারলেন যে মহাবীর রোস্তম তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন। রোস্তম তখন বাদশা কায়কাউস ও অন্যান্য ইরানী সেনাদের মুক্ত করলেন। কিন্তু তারা দৈত্যদের অত্যাচারে অন্ধ হয়ে গেছে। সপেদ দৈত্যের মগজে ও রক্তে তারা নিরাময় হবে।

পরদিন রোস্তম সপেদকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। এটাই তার সপ্তম সঙ্কট। সপেদ সুরক্ষিত পর্বত দুর্গে বাস করত। অনেক দৈত্যের সাথে সম্মুখ সমরে তার শিরশ্ছেদ করে রোস্তম পথ করে নিলেন সপেদ দৈত্যের কাছে যাবার জন্য। তিনি সামনে দেখতে পেলেন নরক সদৃশ এক বিশাল গহ্বর যা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমে গহ্বরের অভ্যন্তরের এক গিরিশৃঙ্গ তার নজরে পড়ল। সেই গিরিশৃঙ্গই সপদে দৈত্য। রোস্তমের সিংহনাদে দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ হল। সে তার লৌহবাহু প্রসারিত করে রোস্তমের দিকে ধাবিত হল। ক্রোধোন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত রোস্তম দৈত্যের হাত ও এক পা তরবারির আঘাতে কেটে

ফেললেন। তার পর শুরু হল মল্লযুদ্ধ। তাদের দাপাদাপিতে সারা পাহাড়ে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। দৈত্য এক সময়ে রোস্তমকে তার নিচে ফেলে দিল। রোস্তমও আল্লাহর নাম নিয়ে দৈত্যকে ধরে মাটিতে ছুড়ে মারলেন। তারপর তরবারি দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন।

সপেদ দৈত্যকে শেষ করে তার কলিজার রক্ত ও মগজের প্রলেপে অন্ধ বাদশা ও তার সেনাদের দৃষ্টি ফিরে এল। মাজিন্দারান রাজ্য আওলাদকে দিয়ে মহাবীর রোস্তম বাদশা কায়কাউস ও তার সঙ্গীদের নিয়ে ইরানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইরানের ঘরে ঘরে তখন খুশীর জোয়ার বইতে লাগল।

এরপর বাদশা কায়কাউস চীন, মাকরান ও বার্বারিস্তান পর্যটন করেন। মাজিন্দারান জয় করার পর তার দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেল। এবার স্থল পথে নয়, জলপথে তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে হামাওরান রাজ্যে এসে হানা দিলেন। হামাওরান রাজ সহজে ছেড়ে দিলেন না। কাজেই উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল। প্রচুর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হামাওরান রাজ বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

এরপর এক গোয়েন্দা এসে কায়কাউসকে জানাল যে, হামাওরান রাজের এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা আছে। একথা শোনার পর বাদশা সওদাবা নামক সেই কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন। হামাওরান রাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদশার প্রস্তাব মেনে নিয়ে অনেক উপঢৌকন ও দাসদাসী, উষ্ট্র ও অশ্বসহ কন্যাকে বাদশার কাছে সমর্পণ করলেন।

হামাওরান রাজ প্রতিশোধ নেবার বাসনায় এক ছল চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। তিনি কন্যা ও জামাতাকে হামাওরানে আমন্ত্রণ জানালেন। সওদাবা পিতার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে সম্রাটকে নিষেধ করলেন। সম্রাট সওদাবার কথায় কান দিলেন না। তিনি বীরবৃন্দ সমভিব্যাহারে হামাওরান গমন করলেন। সম্রাটকে উৎসব আনন্দে ব্যস্ত রেখে একদিন অতর্কিতে তাকে বন্দী করল হামাওরান সৈন্যদল।

বাদশা কায়কাউসের বন্দী হবার পরপরই আফরাসিয়াব এসে ইরান দখল করে বসল। এই সমূহ বিপদে মহাবীর রোস্তম স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অভিযান চালালেন কায়কাউসকে উদ্ধার করার জন্য। হামাওরান বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াই করে তিনি কায়কাউসকে উদ্ধার করে নিয়ে ইরানে ফিরে এলেন।

ইরান তো আফরাসিয়াবের দখলে। মহাবীর রোস্তম আফরাসিয়াবের হঠকারিতা ঘুচিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। জিঘাংসায় মত্ত হয়ে তখন ইরানী ও তুরানী সেনাদল পরস্পরকে আক্রমণ করল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবাহিত হল রক্তের নদী। রোস্তমের বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে আফরাসিয়াব ঘোষণা করল, যে রোস্তমকে পরাজিত করতে পারবে তাকে সে ইরান রাজ্য দান করবে। আফরাসিয়াবের ঘোষণা শুনে তুরানী সৈন্যরা মরিয়া হয়ে রোস্তমকে আঘাত হানার চেষ্টা করল। কিন্তু ইরানী আক্রমণে তারা একদম দিশেহারা হয়ে পলায়ন করল। আফরাসিয়াবও রোস্তমের কাছ থেকে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করল।

শত্রুমুক্ত ইরানে আবার খুশীর জোয়ার বইল। কায়কাউস দেশকে নতুনভাবে সজ্জিত করলেন। বাদশার ফরমান নিয়ে দ্রুত ছুটল দিকে দিকে। রোস্তমকে দান করা হল বিশ্ববীর উপাধি। কারণ বাদশার এই সৌভাগ্যের উৎসই রোস্তম।

কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক বাদশার বুদ্ধি আবার রাহুগ্রস্ত হল। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সে তাকে বলল : সম্রাট জামদেশের মত আপনি সারা দুনিয়ার অধীশ্বর, কাজেই আপনি আকাশে বাতাসে যেখানে খুশী বিচরণ করতে পারেন।

একথা শুনে বাদশা আকাশে উড়বার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। পাহাড় থেকে ঈগল পাখির ছানা এনে মাংস খাইয়ে খাইয়ে তাদের বলশালী করে তুলে তাদের চারটি ঈগলের সাথে সিংহাসন বেঁধে বাদশা তাতে উড়ে পড়লেন আকাশ বিহারে। সিংহাসনের চার কোণায় দীর্ঘ বর্শার আগায় বড় মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঈগলগুলো ঝুলন্ত মাংশখণ্ডের লোভে উড়ে যেতে

লাগল। এবার বাদশা কায়কাউস আকাশ পথে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে ঈগলগুলো দুর্বল হয়ে চীন দেশের মাটিতে এসে নামল। বাদশা তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

ওদিকে মহাবীর রোস্তম সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেললেন কায়কাউসের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে তিনি চীন দেশের সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বাদশাকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে এলেন। কৃতকর্মের জন্য বাদশা লজ্জিত হলেন। এমন

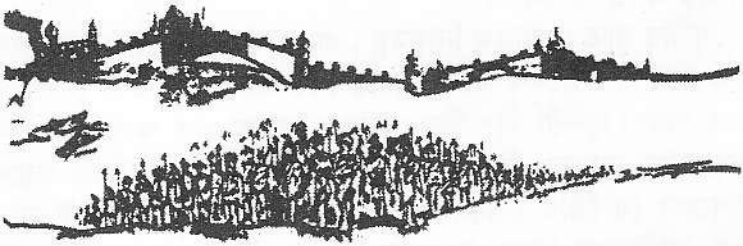

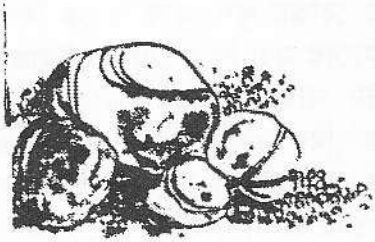

খেয়ালীপনা না করার জন্য তিনি তওবা করলেন। বাদশা এবার দেশের কাজে মন দিলেন। তার অন্তরে ধর্মকর্মের দীপ জ্বলে উঠল। প্রশংসায় দশদিক মুখর হয়ে উঠল।

শাহনামার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান গড়ে উঠেছে রোস্তম পুত্র সোহরাব আর রোস্তমকে কেন্দ্র করে।

মহাবীর রোস্তম একদা মৃগয়ায় সামান গাঁ নামে এক ছোট

রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তুরান ভূমির অন্তর্গত এই স্থানে পৌঁছে রোস্তম তীর দিয়ে কিছু পশু বধ করে অগ্নিদগ্ধ করে আহার করলেন। তারপর রাখ্‌শকে তৃণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে আর রাখ্‌শের দেখা পেলেন না। তখন তিনি ঘোড়ার পদচিহ্ন ধরে সামান গাঁর রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং ঘোড়া ফেরত চাইলেন। রাজা রাখ্‌শকে খুঁজে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বীর রোস্তমকে পরম সমাদরে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করলেন। রোস্তম নিশ্চিন্ত মনে সেখানে রাত্রি বাস করার মনস্থ করলেন।

গভীর রাত। রোস্তম নিদ্রামগ্ন। এমন সময় ঘরের দরজা খুলে কে যেন ঘরে প্রবেশ করল। রোস্তম বিস্ময়ে জেগে উঠে দেখলেন এক পরমা সুন্দরী দীপান্বিত কন্যা। রোস্তম প্রশ্ন করে জানলেন সে কন্যা সামান গাঁর রাজ তনয়া তাহ্‌মিন। তাহ্‌মিনা তাকে বললেন যে তিনি রোস্তমের বীরত্বের খ্যাতি শুনে তাকেই মনে মনে স্বামীরূপে পেতে চেয়েছেন। এখন যদি তাকে বিবাহ করেন তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। আর তাছাড়া রোস্তমের ঘোড়া রাখ্‌শকেও তিনি খুঁজে এনে দেবেন।

পরী সদৃশ রাজকন্যার কথায় রোস্তম খুশী হয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে রোস্তমের সাথে তহ্‌মিনার বিয়ে হল। কিছু দিন সামান গাঁয়ে কাটাবার পর রোস্তমের বিদায়ের সময় হল। তাহ্‌মিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। যাবার সময় রোস্তম নিজের বাহু থেকে একটি কবচ খুলে তহ্‌মিনাকে দিয়ে বললেন : ভাগ্য যদি আমাদের কন্যা দান করে তবে তার কেশে এটা বেঁধে দিও, আর যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার বাহুতে পিতার এই স্মারকচিহ্ন বেঁধে দিও।

রোস্তম প্রথমে ইরান গেলেন। সেখান থেকে জাবালিস্তানে চলে গেলেন। বিয়ের কথা তিনি কাউকে বললেন না। কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলেন সামান গাঁ থেকে পুত্রের জন্ম সংবাদের। এক সময় সংবাদ পেলেন যে তার একটা কন্যা সন্তান জন্মেছে। এ খবরে তিনি নিরাশ হলেন। তহ্‌মিনা তাকে মিথ্যা

সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কারণ, পুত্র সোহরাবকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। পুত্রের জন্ম সংবাদ পাঠালে হয়ত রোস্তম তাকে সাথে করে নিয়ে যাবেন, তাই স্নেহান্ধ জননী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই মিথ্যাই পুত্র সোহরাবের জীবনান্তের কারণ হয়েছিল।

তহ্‌মিনার আদরের পুত্র সোহরাব ক্রমে বড় হতে লাগল। দুঃসাহসিক কাজই তার কাছে আকর্ষণীয় মনে হত। তার বীরত্ব ব্যঞ্জক চেহারা সবারই প্রশংসা অর্জন করত। একদিন তিনি মায়ের কাছে পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে মহাবীর

রোস্তমই তার পিতা।

পিতার পরিচয় পেয়েই সোহরাব পিতাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তহ্‌মিনা এতদিন যে আশঙ্কা করেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হল। সোহরাব একদিন পিতার সন্ধানে সামান গাঁ ত্যাগ করলেন।

ইরানের দুশমন আফরাসিয়াব রোস্তমের কাছে পরাজিত হবার পর থেকেই সুযোগ খুঁজছিল তাকে জব্দ করার। সোহরাবের বীরত্ব দেখে সে এক ষড়যন্ত্র করল। সে বারো হাজার বীর সেনাকে সোহরাবের নেতৃত্বে দিয়ে ইরান আক্রমণ করতে পাঠালেন। এমন ব্যবস্থা করল যে কে কার সাথে যুদ্ধ করছে তা যেন গোপন থাকে। পিতা এবং পুত্র যেন উভয়ের পরিচয় না পায়। কারণ, আফরাসিয়াব মনে করল রোস্তম যদি সোহরাবকে চিনতে পারে বা সোহরাব রোস্তমকে চিনতে পারে তাহলে উভয়ের কেউই অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না। তখন ইরান দখল করা তার পক্ষে আর কখনও সম্ভব হবে না। তাছাড়া সোহরাবের সাথে যুদ্ধে রোস্তম যদি নিহত হয়, তাহলে ইরান সহজেই তার করায়ত্ত হবে। এই চিন্তা করে আফরাসিয়াব সোহরাবকে নানা উপঢৌকন ও প্রশংসা দ্বারা প্রলুব্ধ করল ইরান অভিযানের।

ইরানের সীমানায় শ্বেত দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য পাহারা চৌকী। দুর্গ রক্ষক প্রবল পরাক্রান্ত হুজীরকে পরাজিত করে সোহরাব অবলীলাক্রমে শ্বেত দুর্গ দখল করলেন। ইরানী বীর গুস্তাহামের ভগিনী গাজদাহাম রাজকন্যা গিরদ আফ্রীদ ছিলেন এক যশস্বী সেনানায়ক। হুজীরের পরাজয়ের পর পুরুষের বেশ ধরে গির্‌দ আফ্রীদ সোহরাবের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলেন। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও তিনি অবশেষে সোহরাবের কাছে পরাজিত হলেন।

কায়কাউস বুঝতে পারলেন যে রোস্তম অপেক্ষা শক্তিশালী এই যুবক বীরের হাত থেকে ইরান রক্ষার আর কোন উপায় নেই। তখন তিনি রোস্তমকে ডেকে পাঠালেন মহাবীর সেঁও-এর

মারফতে। রোস্তম তার কাছে সোহরাবের বর্ণনা শুনে বিস্মিত হলেন। সোহরাবের চেহারা নাকি মহাবীর সামের মত। তাহলে তো সোহরাব তার পুত্র। কিন্তু তহ্‌মিনা যে খবর পাঠিয়েছে যে তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। যা হোক এ সব চিন্তা পরিহার করে রোস্তম রাখ্‌শকে তৈরী করলেন, নিজে মাথায় তুলে পরলেন ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত শিরস্ত্রাণ, ও রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর সোহরাবের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তাকে পিতামহ সামের মতই মনে হচ্ছিল তার। তিনি তখন তার সাথে একটু দূরে গিয়ে কথা বললেন : তোমার পরে আমার মায়া হচ্ছে। তুমি বরং চলে যাও। তোমাকে আমি মারতে চাই না। রোস্তমের কথা শুনে সোহরাবের মনে হল ইনি হয়ত রোস্তম। তাই সে তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। রোস্তম বললেন তিনি এক ক্ষুদ্র সেনাপতি মাত্র। এককথায় সোহরাবের মনের সমস্ত আশার বাতি নিভে গেল। সে ভাবল পিতার সাথে তার বুঝি আর দেখা হবে না।

অনেক চেষ্টা করেও রোস্তমকে চিনতে পারলেন না সোহরাব। অবশেষে তিনি যুদ্ধে নামলেন। সংকীর্ণ এক প্রান্তরে দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। বর্শার যুদ্ধে কেউ কাউকে পরাজিত করতে না পেরে অশ্ববল্গা বামদিকে ঘুরিয়ে তরবারির যুদ্ধ শুরু হল। দেখতে দেখতে উভয়ের তরবারি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। তখন দুই বীর টেনে নিলেন গুরুভার প্রহরণ ও তা দিয়ে আঘাত করে চললেন পরস্পরকে। শক্তির প্রচণ্ডতায় প্রহরণ বাঁকা হয়ে গেল উভয়ের। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তারা পরস্পরকে ছেড়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন। একজন বেদনাবিধুর পিতা, অন্যজন ক্লান্তিতে বিচূর্ণ পুত্র।

রোস্তম মনে মনে বললেন এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তো আগে কখনও দেখিনি। এই অজ্ঞাত কুলশীল যুবক বীরের সামনে আমার বীরত্বের গর্ব বুঝি খর্ব হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দুই যোদ্ধাই তুলে নিলেন তীর-ধনুক।

উভয়েই অবিরত তীর বর্ষণ করে চললেন। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। অস্ত্র চালনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে রোস্তম সোহরাবের কোমরবন্ধ ধরে তাকে শূন্যে আছাড় দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু অপারগ হয়ে হাত উঠিয়ে নিলেন। সোহরাব যেন লৌহমানব। তার সাথে পেরে ওঠা রোস্তমের সাধ্যের বাইরে। অথচ যে রোস্তমের পদভারে ধরণী কম্পিত হয়েছে, পাহাড় সদৃশ দেও দৈত্য তার অস্ত্রের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ধরাধাম ত্যাগ করেছে, কত বড় বড় বীর তার সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে গেছে বহুদূরে। অথচ আজ তার হাত যেন চলছে না।

রোস্তমের ভাবান্তর দেখে সোহরাব প্রহরণ তুলে তাকে আঘাত করলেন। রোস্তম তখন সবেগে তুরানী বাহিনীর মধ্যে ঢুকে সৈন্য হনন করতে লাগলেন। সোহরাবও ইরানী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রচুর সৈন্য নিহত করে চললেন। ইরানীরা প্রাণভয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটল।

রোস্তম তখন নিজে সেনাদলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রণহুঙ্কার দিয়ে সোহরাবকে বললেন : হে রক্তপিপাসু যুবক তুমি ইরানী সেনাদের হত্যা করছ কেন?

জবাবে সোহরাব বললেন : এই যুদ্ধে নিষ্পাপ তুরানী সৈন্যরা দূরেই ছিল, তুমিই তাদের উপর জিঘাংসা নিয়ে হামলা চালিয়েছ। তোমার যুদ্ধ করার সাধ মিটেছে তো?

রোস্তম বললেন : আজ দিনের আলো নিভে আসছে, সন্ধ্যা হয়ে এল। তরবারির উজ্জ্বলতা আর এখন দৃষ্টিগোচর হয় না। আগামী কাল ভোরবেলা আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

সোহরাব শিবিরে ফিরে হুমানকে প্রশ্ন করলেন, আজকের প্রতিপক্ষ রোস্তম কিনা। জবাবে হুমান বললেন না, ইনি রোস্তম নন।

ওদিকে রোস্তম সেনাদলে ফিরে গিয়ে সেও, তুখ, গুরগীন ইত্যাদি বীরদের প্রশ্ন করলেন : আজ সোহরাবের সাথে কেমন যুদ্ধ হল?

জবাবে সবাই বললেন : এমন বীর তারা আর কখনও

দেখেনি। তারা আরও বললেন যে একমাত্র রোস্তম ছাড়া আর কেউই তার সমকক্ষ নয়।

রোস্তম তখন বললেন : কোনও বালকের মধ্যে এমন সিংহপুরুষ দুনিয়ায় আর কোনও দিন প্রত্যক্ষ করিনি। সকল রকম অস্ত্র দ্বারাই আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু তাকে হারাতে পারিনি, তবু দেখা যাক আগামীকালকের মল্লযুদ্ধে কে হারে আর কে জেতে। পরদিন প্রভাতে রণক্ষেত্রে দেখা হল পিতা পুত্রের। সোহরাব রোস্তমকে বললেন : আপনি কি মহাবীর রোস্তম? আপনাকে দেখলেই আমার যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে না। আসুন আমরা অস্ত্র বর্জন করে প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হই।

রোস্তম মনে করলেন সোহরাব তাকে প্রতারণা করছেন। তাই তিনি তাকে তাঁর নাম বললেন না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোহরাব মল্লযুদ্ধ শুরু করলেন ও মত্ত হস্তীর মত রোস্তমের কটিবন্ধ ধরে, তাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। জীবনে এই প্রথম পরাজয় রোস্তমের। সোহরাব চড়ে বসলেন রোস্তমের বুকের উপর, হাতে তার তীক্ষ্ণধার খঞ্জর। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই রোস্তমের শির লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

নিরুপায় রোস্তম তখন সোহরাবকে বললেন 'হে বীর, মল্লযুদ্ধে যদি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধরাশায়ী হন তবে তাকে আর একবার সুযোগ দিতে হয়।' একথা শুনে সোহরাব রোস্তমকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন হরিণ শিকারে। অনেক বিলম্বে শিবিরে ফিরে এলে হুমান তাকে যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। সোহরাব তখন সব খুলে বললেন। হুমান বললেন, 'নেকড়েকে আপনি জালে আবদ্ধ করেও মুক্ত করলেন কেন?'

সোহরাব তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আগামীকালই তাকে বেঁধে নিয়ে আসব।'

ওদিকে রোস্তম সোহরাবের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বিশ্বপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন বিজয় ও সাহায্যের। তিনি বললেন : প্রভু আমাকে সেই শক্তি দান কর, যার বলে আমি যুদ্ধে

জয়লাভ করতে পারি। এভাবে প্রার্থনা করার পর রোস্তমের মন থেকে ভয় বিদূরিত হল।

পরদিন যথারীতি যুদ্ধ শুরু হল। মল্লযুদ্ধ চলাকালে পরস্পর পরস্পরের কটিবন্ধ টেনে ধরলেন, সহসা রোস্তম এক হুঙ্কার করে সোহরাবের হুঙ্কার শুনে অবশ হয়ে গেল। নিজেকে তুলে ধরার কোন সামর্থ্যই রইল না তার। এই বেকায়দা অবস্থায় রোস্তম

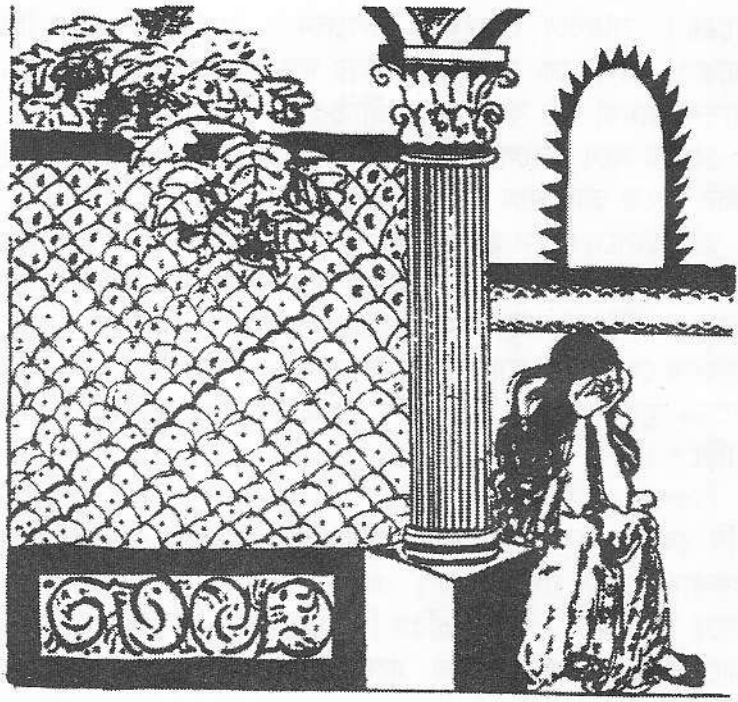

কটিদেশ থেকে তীক্ষ্ণার তরবারি বের করে সোহরাবের বুকে বসিয়ে দিলেন। তরুণ বীরের রক্তে চারদিক রঞ্জিত হল।

সোহরাব তখন আক্ষেপ করে বললেন : তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে উবু অবস্থায় হত্যা করলে। মল্ল যুদ্ধের নিয়ম এ নয়। তুমিই কাল বলেছিলে শত্রুকে প্রথমবার ধরাশায়ী করে হত্যা করতে নেই। আজ তুমি সেই কাজ করলে। কিন্তু আমার পিতা

তার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেবেনই নেবেন। আমার পিতা রোস্তম যখন জানতে পারবেন যে তার পুত্র সোহরাব এমনি অন্যায় ও নির্মমভাবে নিহত হয়েছে।

এই কথা শোনা মাত্র রোস্তম মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সরবে রোদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, রোস্তমের কোন নিশানা কি তোমার কাছে আছে? কারণ আমি তো রোস্তম।

সোহরাব কাতর কণ্ঠে বললেন : মা আপনাকে মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। আর বিদায়ের সময় তিনি আমার বাহুতে এই কবজ বেঁধে দিয়েছিলেন। কবজ দেখে রোস্তম প্রচণ্ড শোকাভিভূত হয়ে নানাভাবে নিজ দেহ পীড়ন করতে লাগলেন। তিনি বললেন : আমিই তোমার হতভাগ্য পিতা, যে তার নিজ পুত্রকে হত্যা করেছে। রোস্তম হায় হায় করে রোদন করতে লাগলেন। সোহরাব তাকে সান্ত্বনা দিলেন ও মায়ের মুখ মনে করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ওদিকে মা তহমিনা যখন এ খবর শুনলেন, তিনি শোকে একদম সম্বিতহারা হয়ে গেলেন। অসহ্য শোকে বিলাপ করতে করতে এক বছরের মধ্যেই তিনি পুত্রের সহগামী হলেন।

সোহরাব পিতা কর্তৃক নিহত হওয়ার পর সমস্ত রণোন্মাদনা থেমে গেল ইরানে। অসহ্য শোকের আগুনে জ্বলতে লাগলেন মহাবীর রোস্তম। তিনি তার সমস্ত অস্ত্র ও তাঁবু অগ্নিতে সমর্পণ করে জন্মভূমি জাবলিস্তানে চলে গেলেন। যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সোহরাবের শবাধার নিয়ে গিয়ে মহাবীর সামের সমাধির পাশে সমাহিত করা হল। তরুণ বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা সোহরাবের স্বল্পায়ু জীবনের এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল।

সোহরাবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইরান তুরানের মধ্যে যুদ্ধ থামল। বাদশা কায়কাউস দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর এক সময় মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর সিয়াউশ সিংহাসনে বসলেন। আলোর শত্রু যেমন অন্ধকার, ইরানের শত্রু আফরাসিয়াব তখনও কিন্তু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তার প্রধান চেষ্টা

ইরানের ক্ষতি করা ও ইরান দখল করা। তাই অল্পদিনের মধ্যেই আফরাসিয়াবের ষড়যন্ত্রে সিয়াউশ নিহত হন। সিয়াউশের পুত্র কায়খসরু তখন ইরানের সিংহাসনে বসলেন।

কায়খসরুই বিশ্ববিখ্যাত কাইরাস বা সাইরাস। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন। তার সময়ে ইরানের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোমসহ তুরানের বহু এলাকা তিনি দখল করেন। আফরাসিয়াব তাই তখনও ষড়যন্ত্র করে চলেছে, কি করে ইরানের পতন ঘটানো যায়। এবার সে সোহরাবের পুত্র বারজুকে নিয়ে ইরানের যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিল। এবারও রইল অপরিচয়ের অন্ধকার। আফরাসিয়াব চান বারজুকে দিয়ে রোস্তমকে ঘায়েল করতে।

সোহরাবের মৃত্যুর পর রোস্তম আর অস্ত্র ধারণ করেন নি। আফরাসিয়াব এবারও যখন ইরান আক্রমণ করে বসল তখন তিনি বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধারণ করলেন। কারণ, ইরানের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব তার। রণক্ষেত্রে বারজুকে দেখে রোস্তমের কেবলই সোহরাবের কথা মনে পড়ছিল। তাই তিনি সহজে ক্লান্ত হয়ে শিবিরে প্রত্যাগমন করলেন। পরদিন আবার একই ব্যাপার ঘটল। তিনি বারজুর বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্রধারণ করতে পারলেন না।

তার এক পুত্র বারজুকে বন্দী করে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তখন রোস্তম তার পরিচয় নিয়ে জানলেন যে সে সোহরাবের সন্তান। একথা শ্রবণ করার পর তার মনের অবস্থা কি হল তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। এবারও আফরাসিয়াব ইরান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। ঘটনার অমোঘ পরিবর্তনের গতি সব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে শান্তি এনে দিল দেশে।

শাহনামায় এর পরের উল্লেখযোগ্য কাহিনী রাজপুত্র এসফেন্দিয়ারের ও তার পিতা গুশতাসামের। সেনাপতির প্ররোচনায় পড়ে বাদশা গুশতাসাম পুত্র এসফেন্দিয়ারকে দৈত্য রাজার সাথে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। এসফেন্দিয়ার ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি জেনে শুনে দুর্গম পথই বেছে নিলেন দৈত্যদের

দেশের যাবার জন্য। বাঘ ও সিংহের হামলা প্রতিরোধ করে, বাঘ-সিংহ হত্যা করে, এসফেন্দিয়ার গিয়ে পড়লেন রাক্ষসের পাল্লায়। রাক্ষসকে জব্দ করার জন্য শাহজাদা পালকী গাড়ির মধ্যে তীর ও বল্লম নিয়ে রাক্ষসের দিকে এগিয়ে গেলেন। বোকা রাক্ষস গাড়িটা গিলে ফেলল আর বিষাক্ত তীরের যন্ত্রণায় পটল তুলল। এভাবে রক্ষা পেলেন বুদ্ধিমান শাহজাদা।

কিন্তু বিপদের তখনও অনেক বাকী। একটা বিশাল সী-মোরগ তার গাড়িটা ছোঁ মেরে নিতে এল। শাহজাদা এসফেন্দিয়ার অমনি বিষাক্ত বল্লম দিয়ে পাখিটাকে আঘাত করলেন। পাখির রক্তের দরিয়ায় শাহজাদা ও তার লোকজনের পা ভিজে গেল রক্তে ভেজা পা নিয়ে তারা সামনের আগুনের নদী পার হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে। অবশেষে তারা পৌঁছে গেল দৈত্য রাজা আরজাম্পের কেল্লায়। সেখান থেকে কৌশলে অপহৃত বোনদের উদ্ধার করে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন শাহজাদা এসফেন্দিয়ার।

বাদশা গুশতাসাম কিন্তু পুত্রের কৃতিত্বে খুশী হলেন না। তিনি চাইলেন এসফেন্দিয়ার যাতে করে বেশী বিপদে পড়ে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই তিনি এবার হুকুম দিলেন রোস্তমকে মারবার।

রোস্তম তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। শরীরে শক্তি নেই। কিন্তু অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি তার পিতার পালক মাতা সী-মোরগের পালক আগুনে ধরে তার কাছে সাহায্য চাইলেন। সী-মোরগ এক গাছের ডাল এনে দিল। তা দিয়ে তীর বানিয়ে রোস্তম এসফেন্দিয়ারকে লক্ষ্য করে আঘাত করলেন। সেই তীরের আঘাতে এসফেন্দিয়ার মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এভাবে বাদশা গুশতাসাম নিজ পুত্রের মৃত্যুর কারণ হলেন।

দিন কেটে যায় সুখে দুঃখে। মহাবীর রোস্তমের জীবনের তরী গিয়ে একদিন ভিড়ল মৃত্যুর সাগরে। ঘটনাটা বড় নিষ্ঠুর ও করুণ। রোস্তমের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন অত্যন্ত হিংসুক ও নিষ্ঠুর। তিনি কাবুলের আমীরের সাথে ষড়যন্ত্র করে রোস্তমের চলার পথে গর্ত করে তার মধ্যে বিষাক্ত তীর ও বল্লম রেখে দেয়।

আমীর রোস্তমকে শিকারে যাবার জন্য সেই পথে আমন্ত্রণ জানায়। যেতে যেতে রোস্তম সেই বিষাক্ত তীর ভরা গর্তে পড়ে গেলেন। তীরের খোঁচায় বিষ তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তখন ভাইয়ের কাছে তীর ধনুক চাইলেন নিজেকে শেয়াল কুকুরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। ভাই রোস্তমকে দুটো তীর ও একটা ধনুক দিলেন। রোস্তম তীর দুটি দিয়ে বেইমান ভাই ও তার সহযোগী আমীরকে শেষ করলেন।

রোস্তম তখন তার প্রিয় অশ্ব রাখ্‌শকে বললেন : চল রাখ্‌শ এবার আমরা শেষ যাত্রা করি।

রাখ্‌শও বৃদ্ধ ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। সে এসে প্রিয় প্রভুর পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর দুজন একত্রে মহানির্বাণের পথে রওনা হলেন।

মহাবীর রোস্তমের মহামৃত্যুর ঘটনার সাথে শেষ হয়েছে অমর কাব্য শাহনামার কাহিনী।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র